ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির
চট্টগ্রাম বিপ্লব

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়
সাধনপ্রসাদ দত্ত

প্রথম প্রকাশ : ১২ জানুয়ারি ১৯৯৬

প্রচ্ছদ : দেবাশিস রায়

অলংকরণ : নৃপেন ব্যানার্জি

যোগাযোগ :

সাধনপ্রসাদ দত্ত

৫৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯

ফোন : ৩৫০,৩৭৫৯

প রি বে শ ক

প্যাপিরাস । ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪

সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে ৪২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৯ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ও ১৯/১ জয়নগর রোড, পাঁচালাইশ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে শ্রীপুলিন দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং টেক্‌নোপ্রিণ্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লব

দ্বিতীয় খণ্ড

উপদেষ্টা-মণ্ডলী

বিনোদবিহারী দত্ত
বিনোদবিহারী চৌধুরী
মনোহর মুখার্জি
সুধীর ঘোষ
শৈলেশ রায়
দীনেশ দাশগুপ্ত
ননী সেন
অরুণকুমার দস্তিদার (টুলু)
অধ্যাপক পুলিন দে

স ম্পা দ ক

প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়
সাধনপ্রসাদ দত্ত

স হা য় ক - সং স দ

সরোজ দাশগুপ্ত
অর্ধেন্দু কানুনগো
বীরেন চক্রবর্তী
হৃদয়রঞ্জন চৌধুরী
সত্যব্রত দাস
আশিস ভট্টাচার্য
শশধর চক্রবর্তী
প্রবোধরঞ্জন সেন
নির্মলেন্দু সেনগুপ্ত
হরিপদ কানুনগো
রথীন তালুকদার
নির্মলচন্দ্র কুণ্ডু
ডাঃ কে. পি. ঘোষ
প্রাণেশ ব্যানার্জি
নির্মল সরকার
কিরণ চৌধুরী
জ্ঞানরঞ্জন ভট্টাচার্য
হরি সেন

সূচি

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লব
বনাম
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ

আই. আর.-এর স্রষ্টা মাস্টারদা সূর্য সেন। তাঁর ছিল আইরিশ ইস্টার বিপ্লবের অনুসরণে মৃত্যুর কর্মসূচী। রণনীতি ছিল গান্ধিজীর মত সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ছিল। মাস্টারদার সুস্পষ্ট নির্দেশ নো কনফেশন, নো সারেণ্ডার, নো সুইসাইড। মাস্টারদার চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হয় যখন গান্ধিজী ডাণ্ডি সত্যাগ্রহের ডাক দেন। মাস্টারদা চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে সমগ্র চট্টগ্রামবাসীকে এই অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৯৩০ সালের একুশে এপ্রিল থেকে দলে দলে যোগ দেবার জন্য ডাক দেন। কিন্তু ঐ দিন আসার আগেই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁর চট্টগ্রাম ইস্টার বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লব চট্টগ্রামে চলেছিল ১৯৪১ সালের ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত।

এই সংগ্রাম প্রথম পরিচালনা করেন মাস্টারদা সূর্য সেন। তিনি বন্দী হলে দলের নেতৃত্বে আসেন তারকেশ্বর দস্তিদার। এঁদের দুজনের ফাঁসী হয় ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী। তখন আই. আর.-এর প্রেসিডেণ্ট হিসাবে বিনোদবিহারী দত্ত আত্মগোপন থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৯৪১ সালের ২২শে আগস্ট যখন তিনি বন্দী হন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে জোর কদমে। ১৯৪২ সালে গান্ধিজী দেশবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের ডাক দেন। তাঁর আবেগ আপ্লুত স্লোগান ছিল, 'ডু অর ডাই'। সারা ভারত এই আহ্বানে উত্তাল হয়ে উঠে।

ব্যক্তি চলে যায় আদর্শ বেঁচে থাকে। স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বড়। গান্ধিজীর ডু অর ডাই এবং মাস্টারদার মৃত্যুর কর্মসূচী একসূত্রে গাঁথা। তার রক্তাক্ত স্বাক্ষর আছে সেদিনের মেদিনীপুরে, সাতারায় এবং বালিয়ায়।

কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির জয়প্রকাশ নারায়ণও সদলবলে এই সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে মাস্টারদা যখন আই. আর.-এর চট্টগ্রাম শাখার বীজ বপন করেন তখন না ছিল এর সর্বভারতীয় অস্তিত্ব, না ছিল এর

চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোন শাখা। মাস্টারদা জানতেন লক্ষ্যে এবং আদর্শে অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেলে একদিন না একদিন চট্টগ্রাম সারা ভারতকে পথ দেখাবে। ১৯৪২ সালে তাঁর সে স্বপ্ন সফল হল। 'চট্ট সূর্য' গান্ধিজীর 'ডু অর ডাই' এবং তাঁর মৃত্যুর কর্মসূচীর সঙ্গমে এসে ভারতসূর্য রূপে দেখা দিলেন। এই মহাতরঙ্গের রেশ মেলাতে না মেলাতে ভারতের মহাকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হলেন নেতাজী। তিনি তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্দেশ্যে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম'।

নেতাজীর এই বৈপ্লবিক আহ্বান ছিল মাস্টারদার, মহাত্মাজীর মৃত্যুর কর্মসূচীর অন্য এক নাম। এইভাবে তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হল।

সূর্য সেন মৃত্যুর কর্মসূচীতে অবিচল থেকে জগৎসভায় আপন স্থান করে নিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে ওপার বাংলায় যখন আরম্ভ হল মুক্তিযুদ্ধ, ওখানে ওঁরা গঠন করলেন একটি বাহিনী 'সূর্য সেন বিগ্রেড' নামে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর জন্ম নিল, স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৪.৪.৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান মাস্টারদার সহযোদ্ধা বিনোদ চৌধুরীকে এক পত্রে লেখেন: '...বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ রক্তঝরা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন বাংলাকে জয়যুক্ত করেছে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বার্থক রূপায়নের মাঝে মাস্টারদার অতৃপ্ত আত্মা আজ খুঁজে পাবে শান্তি। মাস্টারদা অমর হয়ে রইলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে...বাংলার ঘরে ঘরে।'

এইখানেই সূর্য সেনের মৃত্যুর কর্মসূচীর বিশ্বজয়, ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লবের জগৎ জয়। মাস্টারদা ছিলেন বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসুর উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতাবাদী ঈশ্বর বিশ্বাসী। নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন।

এখানে ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে বিনোদবিহারী দত্তের বন্দী হবার পর চট্টগ্রামের মাস্টারদার অনুগামী মৃত্যু-পাগল তরুণেরা কি করেছিল তার উপর যতীন্দ্রমোহন রক্ষিতের লেখা থেকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি:

'১৯৪২ সালে মাস্টারদার দলের নেতৃস্থানীয় কর্মী শশাঙ্ক চৌধুরী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফেরার নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কংগ্রেস কর্মপন্থার পুস্তিকা ও অর্থ চট্টগ্রামে প্রেরণ করে। ...অন্নদা দে, চিত্ত চৌধুরী ও অনন্ত দাস প্রমুখেরা সৈন্যদের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করতে থাকে। শিশিরবিন্দু দত্ত, শঙ্কু

দস্তিদার, হরেন ভৌমিক, জগদীশ ভট্টাচার্য, হরিসাধন সেন ও পরেশ বল প্রমুখের চেষ্টায় শহরের উপর খাসমহল অফিস জালিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় রানী রক্ষিত আর্থিক ও অন্য সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সাহায্য করে-ছিলেন। রাঙ্গুনিয়ায় সৈন্যদের পিকেট-অফিস, মীরেশ্বরীতে ভরদ্বাজ হাট ও করের হাট পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ধুমের নিকট রেললাইন তুলে ফেলা হয় এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়। ঐ কাজের সৈন্যরা গোপনে পেট্রোল ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করেছিল।

১৯৪৩ সালে সুভাষ বোস রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রাম মারফৎ বাংলা তথা ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ...চট্টগ্রামবাসী বহু যুবক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। চট্টগ্রামবাসী ওই সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। শাকপুরার চৌধুরী পরিবার লক্ষাধিক টাকা দান করেন। কানুনগো পাড়ার খোকা রক্ষিত আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রাণ দেন।'

মাস্টারদা করেছিলেন বিপ্লব, বিদ্রোহ নয়। বিপ্লব আনে আমূল পরিবর্তন। বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী. মাস্টারদা সার্থকভাবেই সে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

জালালাবাদ যুদ্ধের পর যখন চট্টগ্রামে আত্মগোপনে থেকে যখন মাস্টারদা গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন শরৎ বসু খবর পাঠালেন, 'আপনার মত অমূল্য প্রাণ আমরা রক্ষা করতে চাই। যদি অনুমতি করেন আপনাকে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি বিদেশে।'

মাস্টারদা সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। 'চট্টগ্রামম্ পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।' যখন বন্দী হলেন, ফাঁসী হবে, মঞ্চ থেকে বিদায় বাণীতে ডাক পাঠালেন তিনি, 'মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মত তোমাদের স্পর্শ করলে, তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।'

বিদ্রোহ তালপাতার আগুন। দপ করে জ্বলে উঠে খপ করে নিভে যায়। বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী।

অনন্ত সিংহ ১৯৬৮ সালে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লবের উপর তিনখানি বই লেখেন। এগুলির নাম অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ (প্রথম খণ্ড)। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ (দ্বিতীয় খণ্ড)। এরপর মাস্টারদার উপর

আরও কয়েকটি গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। গণেশ ঘোষও মাস্টারদার উপর বেশ কিছু লিখেছেন। এঁদের হাতে সূর্য সেনের 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহে' রূপান্তরিত হয়। অনন্ত সিংহের 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম', ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির আদি ও উদ্যোগ পর্ব নিয়ে লেখা। যুব বিদ্রোহ ১ম ও ২য় খণ্ড বিস্ফোরণ পর্বের ইতিহাস। এই পর্বে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিংহ। গণেশ ঘোষ ছিলেন জি. ও. সি এবং অনন্ত সিংহ সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথম রাত্রেই অস্ত্রাগার দখল এবং মাস্টারদার অভিষেকের পর সর্বাধিনায়কের কোনো অনুমতি না নিয়েই তাঁরা মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফলে সেই রাতের যে আসল কাজ শহর অধিকার করা এবং ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশের জন্য আত্মাহুতি দেওয়া থাকে অসম্পূর্ণ। এইভাবে সংগ্রাম শুরু হওয়ার মুখেই ওঁদের জি. ও. সি এবং সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ডের পরিচয় ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লবের মধ্য থেকে চিরতরে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে অসি যুদ্ধে না হলেও মসীযুদ্ধে এঁরা কিস্তিমাৎ করেছেন। এঁদের বইয়ে এঁরা হয় কে নয় করেছেন, নয় কে হয় করেছেন। নিজেদের প্রয়োজনে লেখা এইসব বইয়ে আছে তাঁদের উচ্ছ্বাস বিদ্বেষ ক্ষোভ আনন্দ আশা নিরাশা আবেগ এবং রাজনৈতিক মতবাদ। এই সব বই এঁদের নিজেদের প্রয়োজনে লেখা। মাস্টারদার প্রয়োজনে নয়। এঁরা সারেণ্ডার করেছেন, কনফেশন করেছেন সূর্য সেনকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে খাড়া করে। ভুলে গেছেন ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়। মাস্টারদা যদি কোথাও আদর্শভ্রষ্ট হন, তবে তাঁরও সমালোচনা অবশ্যই হবে। যে মানুষ কাজ করে সে ভুলও করে। পুতুল কাজ করে না তাই ভুলও করে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার আদি পর্বে, বিশেষ করে উদ্যোগ পর্বে এঁদের দান অবিস্মরণীয়। ভাল ভিত না হলে ভাল ইমারত গড়া যায় না। এদিক থেকে দেখলে আই. আর. এর (১৯৩০-১৯৩৪) এর সশস্ত্র সংগ্রামে অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের পরোক্ষ দান চিরস্মরণীয়।

যুববিদ্রোহ প্রথম পর্যায়ে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অস্ত্রাগার সাফল্যের সঙ্গে অধিগ্রহণ করলেও, লুইস গান পেয়েছিলেন, কিন্তু তার গোলা পাননি, আধুনিক রাইফেল পেয়েছিলেন কিন্তু তার বুলেট পাননি। ওঁরা পেয়েছিলেন সাবেক কালের মাস্কেট্রি বন্দুক। এই আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার পরই এর

ব্যারেল এমন উত্তপ্ত হয়ে যেত যে লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে ভালভাবে ঠাণ্ডা না করলে আর গুলি ছোঁড়া সম্ভব হত না। এইভাবে যা পাবেন বলে আশা করেছিলেন তা না পাওয়ায় ওঁরা গভীরভাবে আশাহত হন, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। হয়ত এরই প্রতিফলন পড়ে তাঁদের দল থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে।

পরবর্তীকালে অনন্ত সিংহ অজ্ঞাতবাসে চন্দননগরে থাকাকালীন হঠাৎ আত্মসমর্পণ করেন। এ সম্পর্কে সূর্য সেনের কয়েকজন অন্যতম সহযোদ্ধা এবং একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতামত ভিন্ন স্থানে 'বিনা মন্তব্যে' লেখার মধ্যে পাবেন।

অনন্ত সিংহ আত্মসমর্পণ করে কতখানি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে অর্ধেন্দু গুহর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, '…কথায় কথায় মাস্টারদাকে জানালাম কিছুদিন আগে অনন্তদার নির্দেশমত খানিকটা পটাসিয়াম সায়নায়েড সংগ্রহ করে তাঁকে জেলের ভিতর পৌঁছে দিয়েছি। একথা শোনামাত্র মাস্টারদা প্রথমে অবাক…বললেন, সে সাময়িক মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে এবং তার জন্য একটা বড় ত্রুটি করে ফেলেছে।…আমি বুঝলাম অনন্তদার আত্মসমর্পণ মাস্টারদাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে এবং অনন্তদার এই কাজ যে তাঁর সুস্থ বিপ্লবী মনের পরিচয় নয় একথা মাস্টারদা খুব ভাল ভাবেই জানেন' (বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতিগ্রন্থে অর্ধেন্দু গুহ লিখিত 'আমার দৃষ্টিতে মাস্টারদা' প্রবন্ধ থেকে)।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আকস্মিকভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আগে রণক্ষেত্র থেকে অন্তর্হিত হলেও পরিবর্তিত স্থান কাল পাত্রকে নিয়ে সেই ঐতিহাসিক মহারণ হয়েছিল ১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার জালালাবাদ পাহাড়ে। সেদিনের ইংরেজের সঙ্গে সেই প্রত্যক্ষ সমরে সারথী ছিলেন সূর্য সেন এবং মাস্টারদার নব নির্বাচিত সেনাপতি ছিলেন লোকনাথ বল। এই যুদ্ধে আই. আর. এর দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ ১২ জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আত্মাহুতি দেন। শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। পরাজিত বিধ্বস্ত ব্রিটিশ-বাহিনী রণে ভঙ্গ দেয়। সেদিন মাস্টারদা তাঁর মৃত্যুর কর্মসূচীতে অবিচল থেকে সাফল্যের যে বিজয় মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন সেই আলোকেই পরাধীন ভারত আপন মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

সেদিনের সংগ্রামে সেনাপতি লোকনাথ বল জালালাবাদ পাহাড়ে সাফল্যের যে সাক্ষর রেখেছিলেন তাতে অন্য কোন দেশ হলে স্বাধীনতার পর সর্বাগ্রে তাঁর

নামে স্মারক স্তম্ভরচনা করে দেশবাসী ধন্য হত। ন্যায়নীতিহীন রাজনীতি, ব্যক্তি পূজা, ব্যক্তি বিদ্বেষ নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার পথকে দুর্গম দুশ্চর দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলি। গণেশ ঘোষ যখন অস্তাচলগামী এস. এস. কে. এম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের রোগশয্যায় শায়িত দেশ পত্রিকা তাঁর ইনটারভিউ নিয়ে 'মুক্তিপথের একলা পথিক' বলে তাঁর জীবন থেকে নেওয়া কিছু ঘটনা অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই লিখনে কিছু মোটা তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল আছে দেখে প্রবোধরঞ্জন সেন দুটি পত্র পাঠান দেশ পত্রিকায় এবং সেগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হয়। চিঠি সেলফ এক্সপ্ল্যানেটারি। পরিশিষ্টে রাখলাম।

যুববিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায় একটি নিষ্ফল জেল থেকে বন্ধনমুক্তির আন্দোলন। দলে দলে স্বীকারোক্তির একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্র'নামে একটি লেখা তৎকালীন বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।

মামলা চলাকালীন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম লোকনাথ বল। এঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন আন্দামানে। এঁরা সূর্য সেনের মত ও পথকে নিহিলিস্ট বলে ধিক্কার দিয়ে কম্যুনিস্ট কনসলিয়েশনে যোগ দিলেন।

কেন্দ্রিয় কমিটির পাঁচজনের মধ্যে নির্মল সেন প্রাণ দিলেন ধলঘাটের যুদ্ধে, ১৯৩৪ সালে সূর্য সেন প্রাণ দিলেন ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করে আত্মাহুতি দিলেন। ১৯৪২ সালে যখন গান্ধিজীর 'ডু অর ডাই' এর সঙ্গে সূর্য সেনের 'ডু এণ্ড ডাই' গাঁথা হল একসূত্রে, গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিংহ স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জানালেন, এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'।

১৯৪৩ সালে ভারতের আকাশ আলো করে এলেন নেতাজী। তিনি তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ডাক দিয়ে বললেন—"give me Blood, I will give you freedom."

সব নদী এক মহাসাগরে এসে মিললো—তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভেসে গেল ইংরেজ সাম্রাজ্য।

সূর্য সেনের জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত। কিন্তু তিনি আজও তাঁর যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত। গান্ধিজী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নবমূল্যায়ণ হয়েছে। আমরা সেই সঙ্গে সূর্য সেন লোকনাথ বল প্রমুখের নিরপেক্ষ সত্য মূল্যায়ণ দাবী করি। তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় রইলাম।

বিজয়া

সূর্য সেন

তোমার ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে! কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ—এবারকার বিজয়া যেন সব চেয়ে বেশি মূল্যবান! জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি এমন কত অভিনব জিনিস নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো! গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল। আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সবকিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাইনি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য, একান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা দুর্বল মানব—আমাদের কাছে এত সুন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল যে, তাকে হারাবার ব্যথাই বড় হয়ে উঠল।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—আর পূর্ণ দায়িত্বই

ঘাড়ে নিলাম—আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে। আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করে নি, একটু সঙ্কোচ করে নি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে—তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠেছে। নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্ধেন্দু প্রভাস, নির্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, নির্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্য দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম—কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি। কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি—দেশের উপর গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে?

মা, আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিসর্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি—আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্বলতা কি আসতে চায়নি? কত রকমের দুর্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়ি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই—সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমার পথেই আমি চলেছি—এখনও কোন দ্বিধা আসেনি। মা তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙে দিও, আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তিমান্ করে দাও—আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্বলতা

না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। আমি যেন বড় নিষ্ঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন—সেজন্য আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন মর্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন! কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে—বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে! বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন! ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! কত বড় অভাববোধ তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে! এসব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে। আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাই-বোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি? যদি তাই হয়, তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি—এই আশায় যে এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তূপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদাতো তোকে জীবনে আর কোনদিন সাজাবে না", তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত

বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল ! সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না—শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে। সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না ! আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলেছ—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—"চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।"

সে যে আমার আনন্দের উৎস—নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল—সুন্দর, পবিত্র মহান্ ছিল ! তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মানুষের মধ্যে তত গুণ আমি দেখিনি। তার অন্তরের সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না। সর্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজায় রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম—হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম—প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাইনি। এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সে দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল। দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে—আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার ! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, তুমি আমায় এই বর দাও—যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে—তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি—"রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষক্রটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস্ না। তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—তোর ভগবানে ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি—এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি। তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনদিন ইতস্ততঃ করিনি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিস্ও নাই—শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস্। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস্ সেখান থেকেই আমার সব দোষক্রটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তো তুই দেখছিস্। তোর দাদা যেন শান্তি পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস্ না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষক্রটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর্। আমার স্নেহের সম্ভাষণ—শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি। আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ-বিসম্বাদ, দোষক্রটি ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়েই প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নির্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদানে তোকে আরও সুন্দর, আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার; আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার স্নেহের প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ক্রটি না করে।

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

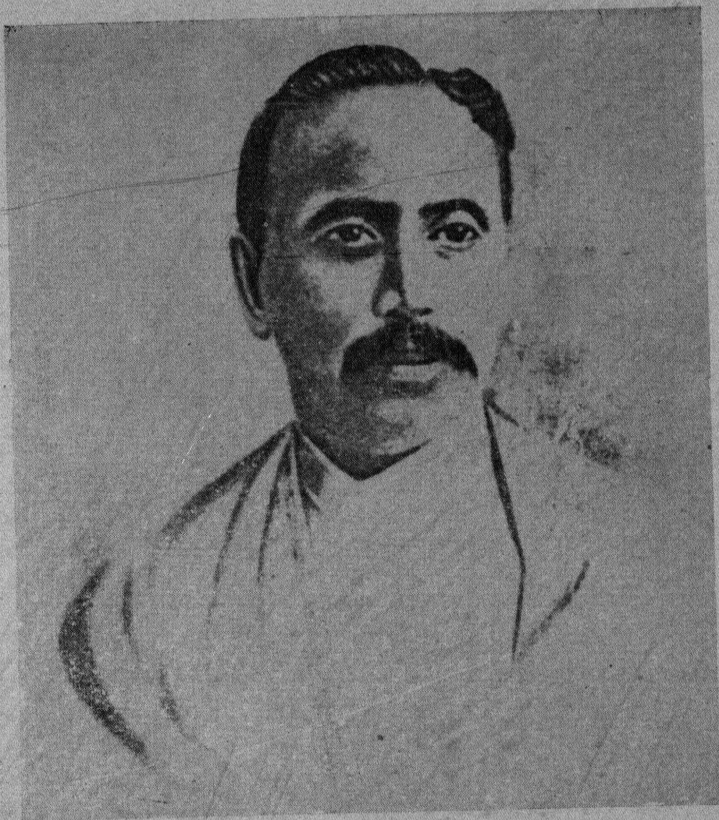
শান্তি! শান্তি! শান্তি!

অনুভূতি

সূর্য সেন

সেদিন বিজয়ার সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে উঠানে কয়েকজন লোক হরিনাম কীর্তন করছিল, শরতের জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না—যে স্নেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে হারিয়েছি তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। গানও তেমন শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না, হঠাৎ যেন নাম কীর্তনটা আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানালার ফাঁক দিয়ে গায়কদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর অনুভূতি এসে আমার অন্তরে একটা আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করল। মনে মনে একটা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ছবি খুঁজতে লাগলাম—মনে পড়ে গেল পনের দিন আগে বিসর্জনের দিনে প্রতিমাকে সঙ্গে ছোট শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর মূর্তিটি মানসনেত্রে দেখতে দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তাঁর ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কীর্তনের সুর কানের মধ্যে মধুর বাজতে লাগল। মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল যার বিসর্জনের দিনে মূর্তিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম সে কথা। মনে হল হরিনাম কীর্তন শুনলেই তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং গায়কদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম গাইত। আমার ধ্যানেও মূর্তিটিও সরে গেল না, অথচ মানসনেত্রে দেখতে পেলাম সে কত যত্ন করে ফুলের আসন সাজায়ে এই মূর্তিটিকেই পূজা করছে—ধ্যানস্তিমিত নেত্রে মূর্তিটির পানে চেয়ে আছে। আর তার দু'চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ধ্যানের মূর্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মূর্তিটি—দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। কতক্ষণ পরে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখের জল মুছে আমার অনুভূতিটির কথা ভাবলাম। ভাবলাম, যাকে হারিয়েছি তার শোকে সারা দিনরাত দগ্ধ না হয়ে এ ভাবের অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়—হারাবার ব্যথাটাকে আনন্দে পরিণত করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থভাবে অনুভব করা যায়।

ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্বল করেছ কেন? এই আনন্দটুকুকে স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দাওনি কেন?



নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম : ১৮৪৭ খ্রীঃ　　　মৃত্যু : ১৯০৯ খ্রীঃ



কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সংবিধান রচয়িতা এবং বুড়ুল
হাইস্কুলের শিক্ষক শহীদ অনুরূপচন্দ্র সেন।

জন্ম : ১৮৯৮ খ্রীঃ মৃত্যু : ১৯২৮ খ্রীঃ



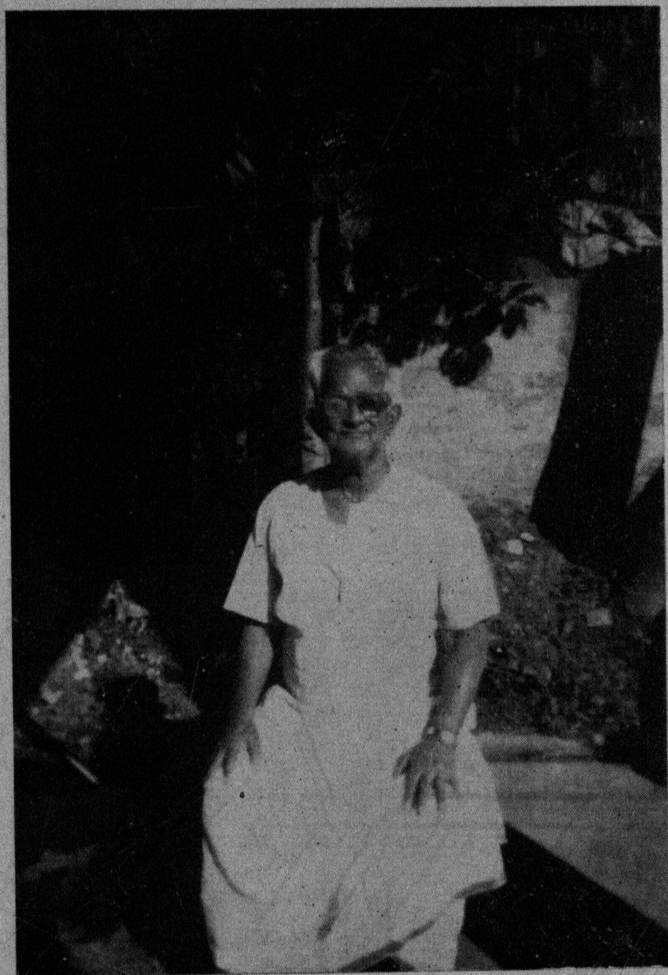
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারপিষ্ট অন্তরীণ অবস্থায় শহীদ অনুরূপচন্দ্র সেনের অন্তিম জীবনের চিত্র



নির্মল সেন
ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ



লোকনাথ বল
জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি



শৈলেশ রায়
কুখ্যাত এস. পি এলিশন হত্যাকারী

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন

কিরণ চৌধুরী

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ খৃস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন রায় ও মাতার নাম রাজ-রাজেশ্বরী দেবী। ইহাদের বংশের নবাব প্রদত্ত উপাধি 'রায়'। নবীনচন্দ্র 'রায়' উপাধি ত্যাগ করিয়া পূর্বপুরুষদের 'সেন' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র বিপ্লবের সময় নবীনচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীযুক্ত রায় নামক জনৈক ব্যক্তি হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোন পল্লী হইতে সুদূর চট্টগ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। তদবধি বংশ পরম্পরাক্রমে নবীনচন্দ্রকে লইয়া নয় পুরুষ যাবৎ তাঁহারা চট্টগ্রামে বাস করেন। শ্রীযুক্ত রায় হুগলি হইতে চট্টগ্রামে গিয়া নবাবের রাজস্ব সচিবের ভারপ্রাপ্ত হন।

নবীনচন্দ্রের পিতা গোপীমোহন রায় একজন সুকবি। তিনি চট্টগ্রামে জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে মুন্সেফ হন। পাঁচ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। কিছুদিন গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া ৮ বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রাম শহরে পিতার নিকট আসেন ও চট্টগ্রাম উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। বাল্যকালে নবীনচন্দ্র এত দুরন্ত ছিলেন যে বিদ্যালয়ে তিনি দুষ্ট শিরোমণি অর্থাৎ wicked the great উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঠাকুরমা যখন রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন তখন তিনি দুষ্টামি ছাড়িয়া সুর করিয়া তাঁহার সহিত রামায়ণ মহাভারতের কবিতাগুলি সুন্দর ভাবে পাঠ করিতেন।

এই সম্বন্ধে তিনি আত্ম-জীবনতে লিখিয়াছেন—পিতা ও পিতৃব্যরা সুগায়ক, সুরসিক, সুকবি। কবিতানুরাগ আমার বংশগত। আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। পাখির যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ,

কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায়, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বয়স যখন ১০/১১ বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজার (কবি ঈশ্বর গুপ্ত) অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রাম হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেন। এবং প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়া ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পুরস্কার পান। অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ এবং জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন (অধুনা স্কটিশচার্চ কলেজ) হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ পাশ করেন। এফ. এ পরীক্ষা দিবার সময় মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দে বি. এ পরীক্ষার মাত্র তিনমাস পূর্বে নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়, পিতা একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভার তাহার উপর পড়িল, তখন তিনি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিলেন, সংসারে মা, কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা, দুইটি অনুঢ়া ভগিনী ও আরও অনেকে পোষ্য ছিলেন। এদিকে মাত্র কুড়ি টাকা তখন তাঁহার আয়, তাহাও নিজের পড়ার খরচে ব্যয় হইত। এই সময়ে মহাজীবন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সক্রিয় সাহায্যে ও আর্থিক দানে নবীনচন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন।

বি. এ পাশ করিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংশয় থাকায় তিনি প্রথমে বেঙ্গল অফিসে স্বইচ্ছায় ৪০ টাকা বেতনে এসিসটেন্ট পদ গ্রহণ করেন। সাত দিন পরে তাঁহার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ আসে। প্রথমেই প্রেসিডেন্সি ডিভিসনে যশোহর জেলায় তাঁহার নিয়োগ হয়, কিন্তু কর্মে যোগদানের পূর্বে ছুটি লইয়া চট্টগ্রামে গিয়া মায়ের চরণ বন্দনা করেন। ১৭ জুলাই ১৮৬৮ হইতে ৩০ জুন ১৯০৪ পর্যন্ত তিনি সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

চাকুরী তাঁহার তেজস্বী জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় নাই, সমগ্র চাকুরী জীবনে উর্ধ্বতন কর্মচারীগণের সহিত প্রায় সংঘর্ষ লাগিত। তাঁহার বিবেক তাঁহাকে যে পথে চালিত করিত, তিনি দৃঢ়তার সহিত সেই কার্য করিতে কখনও

পশ্চাৎপদ হইতেন না, তজ্জন্য তাঁহাকে উর্ধ্বতন ইংরেজ রাজপুরুষগণের ভ্রূকুটি ও অসন্তোষ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে একবার তাঁহাকে দেড় মাসের জন্য সাসপেণ্ড পর্যন্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের তেজস্বিতা, মনের দৃঢ়তা এবং অদম্য সাহস তাঁহাকে দেশবাসীর হৃদয়ে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার যে সকল স্থানে শাসনভার তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল প্রদেশে কোন না কোন হিতকর কার্যে তাহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, ন্যায়পরায়ণতা এবং পরোপকারিতাকে তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

১২৭৮ সালে কবির প্রথম গ্রন্থ "অবকাশ রঞ্জিনী" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই খণ্ড কাব্যে সর্ব প্রথম তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার অনভিজ্ঞ পিতৃহীন যুবকের হৃদয়ের বেদনা ইহার স্তরে স্তরে প্রতিফলিত। কবি তাঁহার নিজের জীবন হইতে এইসব ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা এত মর্মস্পর্শী হইয়াছে।

তাহার পর ক্রমশ তাঁহার প্রতিভা উন্মোচিত হইতে লাগিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে পলাশির যুদ্ধ (১২৮২), ক্লিওপেট্রা (১২৮৪), অবকাশ রঞ্জিনী ২য় ভাগ (১২৮৪), রঙ্গমতী (১২৮৭), রৈবতক (১২৯৩), শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (১২৯৬) খৃস্ট (১২৯৭), প্রবাসের পত্র (১২৯৯), কুরুক্ষেত্র (১৩০০), মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (১৩০০), অমিতাভ (১৩০২), প্রভাস (১৩০৩), ভানুমতী উপন্যাস (১৩০৭), আমার জীবন ১ম হইতে ৫ম ভাগ (১৩১৪-১৩২০) ও অমৃতাভ (১৩১৬) প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দে শেষ ভাগে প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতে আগমন করেন। সেই সময়ে বিলাতের ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানি ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষায় তিনটি কবিতার জন্য তিনটি পারিতোষিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, নবীনচন্দ্র "ভারত উচ্ছ্বাস" নামক একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহার ইংরেজি অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইয়া দেন। এবং তাহার কবিতাটি সর্বোৎকৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি পঞ্চাশ গিনি পারিতোষিক পান।

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তীকালে বাংলা কাব্য সাহিত্য জগতে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কারণ তাঁহারা উভয়েই নিদ্রিত বাঙালি

জাতিকে স্বধর্মপ্রিয়তা ও স্বাদেশীকতায়, মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। 'এডুকেশন গেজেটে' নবীনচন্দ্র সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক কবিতা রচনা করেন। এই সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"এ স্বদেশ প্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় এবং যশোহরে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। বোধহয় শিশিরবাবু গদ্যে "অমৃত বাজার পত্রিকায়" এবং আমি পদ্যে এডুকেশন গেজেটে প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি।

নবীনচন্দ্র স্বভাব কবি ছিলেন, তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, তজ্জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বায়রণের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-চন্দ্র বলিয়াছেন—

ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্য। বাঙ্গলাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্য। তাঁহাদিগকে হৃদয় নিরুদ্ধ ভাবসকল আগ্নেয়গিরি নিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য।"

কবি নবীনচন্দ্র সেন যখন নোয়াখালী জেলার ফেনী মহাকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হন, তখন তরুণ সাধক রামঠাকুরের সহিত তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কবিবর জানতে সক্ষম হন। তাঁহার দু'একটি বিস্ময়কর বিভূতি লীলা দর্শনের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। নবীনচন্দ্র, ঠাকুর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, ঠাকুরের তৎকালীন জীবনের একটি মনোজ্ঞ রেখাচিত্র তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী নবীনচন্দ্রের দেহান্ত হয়, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার প্রদত্ত রত্নরাজি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

সূর্যের অনুরূপ, অনুরূপ সেন

কিরণ চৌধুরী

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পরিবারে অনুরূপচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিতান্তই দরিদ্র ছিলেন। তাই গ্রামের স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে তাঁকে পড়াশুনা করতে হতো। ভালো ছাত্র বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, ছাত্র সমাজেও তিনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু বাড়ির অবস্থা এতোই খারাপ ছিল যে, নতুন শ্রেণীতে ওঠবার পর বইপত্র কেনাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো। তবু সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন বলেই অপরের কাছ থেকে বইপত্র চেয়ে-চিন্তে কোন মতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে ধর্মাভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্র সেই সময় একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর চারজন অনুরাগী বন্ধু কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লেন না। অনুরূপচন্দ্র দেখলেন ধর্মসাধনার পথে সঙ্গী নিয়ে চলা দায়, কাজেই ফিরতে বাধ্য হলেন। এ নিয়ে বহু লোকের বহু বক্রোক্তি তাঁর উপর বর্ষিত হলো। তিনি নীরবে সমস্ত মাথা পেতে সহ্য করলেন।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনুরূপচন্দ্র শহরে এলেন। এইখানে তাঁর বিপ্লবী জীবনের আসল সূত্রপাত। দলের কাজে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। সে সময় জনৈক ফেরারি বিপ্লবী নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নানা রকমে তিনি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে থাকেন।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা এই সময় কয়েকজন বিপ্লবী তরুণকে অত্যন্ত বেশি প্রভাবিত করেছিল। ফলে তাঁদের অনেকেই বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধন জীবন যাপন করাই স্থির করে বসেছিলেন। অনুরূপচন্দ্রের বিরাগী মনে এদিক থেকে যে আকর্ষণ এসেছিল তাও অতি তীব্র। কিন্তু কয়েকজন সহযোগী তাঁকে ও পথ থেকে বিরত করলেন। দলের শৃঙ্খলা তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম। সে সময়ে দলের সংহতিকে টিকিয়ে রাখার অনেকখানি কৃতিত্বই অনুরূপচন্দ্রের প্রাপ্য।

শ্রীপ্রভাস রায় এক জায়গায় লিখেছেন "এক সময় চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের কার্য পরিচালনার কৌশল সংক্রান্ত প্রশ্নে শহীদ সূর্য সেনের সঙ্গে স্বর্গীয় চারুবিকাশ দত্তের তীব্র মত পার্থক্য দেখা দেয়। তখন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নেতাদের ও প্রধান প্রধান কর্মীদের নিয়ে এক সভা হয়। সেই সভায় শহীদ অনুরূপ সেন মাস্টারদার বক্তব্য সমর্থন করেন এবং স্বর্গীয় চারুবিকাশ দত্তের বক্তব্য যে ভুল তা তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন। শহীদ অনুরূপচন্দ্রের যুক্তি ও মত সকলে মেনে নেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সকল নেতা ও তৎকালীন প্রধান প্রধান যুবনেতারারা—সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর যুক্তি ও মত মেনে নিতেন। তবু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, তীব্র মতপার্থক্য সত্ত্বেও চারুবিকাশ দত্ত তাঁর গ্রন্থে অনুরূপ সেনের প্রসঙ্গ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন।

১৯১৮ খৃস্টাব্দে দলের অবস্থার কথা লিখতে গিয়ে অনন্ত সিংহ লিখেছেন "চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে—

১। সূর্য সেন—(মাস্টারদা) ন্যাশানাল হাইস্কুলের সিনিয়র গ্রাজুয়েট শিক্ষক।

২। অনুরূপচন্দ্র সেন—চব্বিশ পরগনার বুড়ুল হাইস্কুলের গ্রাজুয়েট সহকারী প্রধান শিক্ষক। (আদি নিবাস চট্টগ্রাম)

৩। নগেন সেন (জুলু সেন)—৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ভূতপূর্ব সদস্য—প্রথম মহাযুদ্ধ প্রত্যাগত।

৪। অম্বিকা চক্রবর্তী।

৫। চারুবিকাশ দত্ত।

"যে পাঁচজন নেতার কথা উল্লেখ করেছি এঁদের মধ্যে অনুরূপদার নাম পরে আর শোনা যায়নি। ১৯৩০ সালে যদি তিনি আমাদের মধ্যে থাকতেন তবে আমার মনে হয় তিনি হতেন দলের প্রধান পরিচালক। কারণ মাস্টারদা, জুলুদা, অম্বিকাদা তিনজনই তাঁকে শ্রদ্ধা, সম্মান করতেন। বহু ক্ষেত্রে অনুরূপদার যুক্তি তাঁরা মেনে চলতেন।"

"ভালো বলতে পারতেন, ভালো লিখতে পারতেন অনুরূপদা অল্প কথায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের গোপন সংবিধান রচনা করেছিলেন তিনিই—পরে সেটা অনুমোদন করি আমরা সকলে।"

১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলো। ইংরেজ পক্ষ জয়ী হলো, কিন্তু ভারতবাসীর তাতে কোন স্থবিধা হলো না। বরং ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকেই এলো কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্ট, ভারতব্যাপী তার প্রতিবাদ এবং ১৩ এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবের অমৃতসরে হলো কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কাণ্ড। শ্রীগণেশ ঘোষ বলেছেন—

"যুদ্ধ শেষে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর ও অমানুষিক গণহত্যার পর যেমন জাতীয় নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবহার সঙ্গে সর্বপ্রকারের অসহযোগিতা করবার জন্য ভারতের জনগণকে উপদেশ ও নির্দেশ দেন তখন বাংলাদেশে ঐ নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করবার জন্য দেশবন্ধুর মধ্যস্থতায় ১৯২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজীর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দের একটি গোপন বৈঠকে একটি মৌখিক চুক্তি হয় এবং গান্ধীজীর অনুরোধে বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতৃত্ব অন্তত এক বছরের জন্য নিজেদের বিপ্লবী কর্মস্থচী স্থগিত রাখতে স্বীকৃত হন এবং অনেকেই কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের কর্মস্থচী সফল করে তুলবার জন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন করতে সম্মত হন।"

চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃবর্গও ঐ একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাকে কার্যকর করতে সম্মত হন। "চট্টগ্রামে এই সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে উদ্যোগ নিয়েছিলেন অনুরূপদা এবং মাস্টারদা সূর্য সেন"। শ্রীগণেশ ঘোষ আরো লিখেছেন—

"একটি বিপ্লবী দলের পক্ষে অহিংসার নীতি গ্রহণে দলের অনেক কর্মীর মনেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে, অনেক অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করে দলের প্রত্যেকটি যুবকের মনে বিপ্লবী পথ ও পন্থা সম্বন্ধে বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোনরূপ বিপ্লবী সংগ্রামের পূর্বেই যদি বিপ্লবী দলের নীতি পরিবর্তন করে আবার অহিংসার নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়। যতদূর মনে আছে, সেই সময় অনুরূপদা চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের প্রায় প্রত্যেকটি তরুণের সাথে আলোচনা করে, তাদের সঙ্গে অধ্যবসায়ের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের প্রত্যেককেই সাময়িকভাবে অহিংস অসহযোগের নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে তাদের মনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এঁদের যুক্তিটা অনেকটা ছিল এই রকম: তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস পন্থায়

বিশ্বাসী নন। কিন্তু যে অসহযোগের ডাকে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠছে চট্টগ্রাম কি তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে? তাই শেষ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে হাত মেলানোই স্থির হলো। শোনা যায়, অনুরূপচন্দ্র সে সময় কলকাতায় থেকে এম. এ. পড়ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এসে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে যোগ দেন। শ্রীগণেশ ঘোষ বলেছেন, "অনুরূপদার বক্তব্য কোন সময়েই দীর্ঘ হতো না, তাঁর বক্তব্য স্বল্প কথায় হতো বলেই তাঁর বক্তব্যের যুক্তি যেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো, তেমনি প্রায় অপ্রতিরাধ্য ও বোধ্য হতো।

'অনুরূপদার মন অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল। সেই সময়ে, সেই প্রথম যুগে, চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের মধ্যে অম্বিকাদা, মাস্টারদা ও অনুরূপদা ছিলেন অন্য সকলের চাইতে বয়সে বড়ো। ছোটোদের প্রতি অনুরূপদার স্নেহ ছিল অপরিসীম। অনেক সময়ে মনে হয়েছে তা যেন মায়ের স্নেহের মতো। এই স্নেহ ভালোবাসা এবং কথা-বার্তার ধরন ও যুক্তির শক্তিতেই অনুরূপদা যেন সকলকে সম্মোহিত করে ফেলতেন। "বিপ্লবী দলের আদর্শ সম্পর্কে এবং সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে অনুরূপদার মনে ছিল অনমনীয় দৃঢ়তা। কিন্তু সেই আদর্শের বিষয় নিয়ে আলো-চনার সময়েই অনুরূপদার বক্তব্য শুনে কারও কখনও মনে হয়নি যে তিনি কিছুটা জিদের বশবর্তী হয়েই বলছেন। বিশেষভাবে, ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দেওয়া সম্পর্কে এবং কংগ্রেসের অনুসৃত কর্মনীতি গ্রহণ করা সম্পর্কে সকলকে বোঝাবার জন্য অনুরূপদাকে প্রায় নিরন্তর কথা বলতে হয়েছে। সেই সময়ে চট্টগ্রাম জেলার কংগ্রেসের ছোটো বড়ো অনেক নেতার সাথেই তাঁকে বহু সময়েই অনেক কথা বলতে হয়েছে, অনেক আলোচনা করতে হয়েছে। কিন্তু অনুরূপদার সাথে আলোচনার পর তাঁদের কেউই বিরক্ত অথবা বীতরাগ হননি এবং তাঁদের কারও মনে হয়নি যে তাঁর কথায় যুক্তির চেয়ে জিদ বেশি।

অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা দেশ জুড়ে সুরু হলো তখন দেখা গেল, অনন্ত সিংহের ভাষায়: "আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সদস্যরাও পিছিয়ে নেই। সূর্য সেন ও অনুরূপ সেনের নেতৃত্বে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহযোগ আন্দোলনে।"

সঙ্গে পর পর কটি ধর্মঘটও দেখা দিল। শুধু ছাত্র ধর্মঘট নয়—বিলেতি স্টীমার কোম্পানির ধর্মঘট এবং চা বাগান শ্রমিকদের সমর্থনে ও নিজস্ব কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট। শেষোক্ত ধর্মঘটে 'যতীন্দ্রমোহনের (সেনগুপ্ত) পাশে এসে দাঁড়ালেন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতারা—সূর্য সেন,

অনুরূপ সেন ইত্যাদি। দেখতে দেখতে সমস্ত দেশ একটা অননুভূত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন বেশি দূর অগ্রসর হবার আগেই ঘটে গেল চৌরিচৌরার ঘটনা (৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২)। মহাত্মা গান্ধী অপ্রত্যাশিতভাবে আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অনুরূপচন্দ্র এবং তাঁর দল উত্তেজনার মুখে এমন ধরনের বাধাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। আলোচনা সভা বসলো। এ সভায় সূর্য সেন, জুলু সেন ও আরও অনেকের সঙ্গে অনুরূপচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। বহু আলাপ আলোচনার পর ত্বরিৎ কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। নানা জায়গায় বিপ্লবী কার্যকলাপ আবার নতুন উদ্যমে সুরু হয়ে গেল।

১৯২২ খৃস্টাব্দেই অনুরূপচন্দ্র বুড়ুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তখন ইস্কুলে ঐ নামই ছিল। অনন্ত সিংহ এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন "তখন তিনি ছিলেন বুড়ুল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অন্যত্র অনন্ত সিংহ আবার এও বলেছেন যে তিনি ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক" আমরা আগেই এটা লক্ষ্য করেছি। দুটোই ভুল তথ্য। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক। প্রয়াত গণেশ ঘোষ বলেছেন,

"তরুণ বয়সে কলেজে পড়বার সময়, যখন অনুরূপদা জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য বিপ্লবের পন্থাই একমাত্র সঠিক ও কার্যকর পন্থা বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়েই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ; নিজের জীবিকার জন্য তিনি শিক্ষকতার কাজই গ্রহণ করবেন, কারণ তা হলেই জীবিকা অর্জনের সাথে সাথে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য কর্মী সংগ্রহের সুযোগও তাঁর কাছে সতত উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু চট্টগ্রামের কোনও স্কুলে যখন শিক্ষকের কাজ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না তখন তিনি কোলকাতায় চলে যান এবং কিছু সময় হুগলির বিদ্যামন্দিরের সাথে যুক্ত থাকার পর ১৯২২ সালে জানুয়ারী মাসে চব্বিশ পরগনা জেলার বুড়ুলে শিক্ষকের কাজ নিয়ে সেইখানেই চলে যান।"

হুগলি জেলার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য বিজয় মোদকের কাছ থেকে জানা গেছে, অনুরূপচন্দ্র যে সময় হুগলি বিদ্যামন্দিরে যোগ দেন সে সময় তিনি (বিজয়বাবু) ছিলেন ঐ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র—তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন হামিদুল হক ও সিরাজুল হক, প্রধান শিক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ পালিত এবং সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন,

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শ্রীগণেশ ঘোষের মতো শ্রীপ্রভাস রায়ও বলেছেন ১৯২২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অনুরূপচন্দ্র বুড়ুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে আসেন। কাজেই তারিখটা সঠিক বলেই আমরা মনে করি। এই তারিখ কিন্তু তা হলে চৌরিচৌরা ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কিছু আগের ঘটনা। এতে ঘটনার পরমপরা বিন্যাসের কিছুটা অসুবিধের সৃষ্টি হতে পারে, তবে একেবারে তা অসম্ভব নয়। এমন হতেই পারে যে অনুরূপচন্দ্র দলের পরামর্শে ১৯২১ সাল থেকেই কলকাতার কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গাড়বার চেষ্টা করছিলেন। যাই হোক আমরা ঐতিহাসিক খুঁটিনাটির ওপর তেমন জোর না দিয়ে ঘটনার সাধারণ গতিকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করবো।

অনুরূপচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ছাত্র প্রয়াত মুরারিশরণ চক্রবর্তীও লিখেছেন—

"অনুরূপচন্দ্র সেন তাঁহার বিপ্লবী দলের নির্দেশেই ১৯২২ সালে বুড়ুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপে বুড়ুলে আসেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ঠিক কী ছিল? একটি উদ্দেশ্যের কথা আমরা আগেই শ্রীগণেশ ঘোষের লেখা থেকে জানতে পেরেছি। বিপ্লবী জীবনের অনেক কিছুই চিরদিন অজ্ঞাত বা রহস্যাবৃত থেকে যেতে বাধ্য। পরিচিত সকলেরই এটা জানা ছিল যে অনুরূপচন্দ্রের শরীর কোন-দিনই তেমন সুস্থ ও সবল নয়। কঠিন কায়িক শ্রম যে কাজে প্রয়োজন সে কাজ তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ দলের পক্ষে তিনি ছিলেন অপরিহার্য তাই তাঁকে এমন একটি কাজের ভার দেওয়া হয় যা বুড়ুলের মত অখ্যাত গ্রামে থেকেই সম্ভব। কেননা বুড়ুলের দূরত্ব কলকাতা থেকে ২৫ মাইলের বেশি নয়, কাজেই দরকার হলে কলকাতা থেকে বুড়ুলে এবং বুড়ুল থেকে কলকাতায় কিছুটা হাঁটা পথেও যাতায়াত করা অসম্ভব ছিল না। অথচ পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি বুড়ুলের মতো গণ্ডগ্রামে পৌঁছবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই সেদিন ছিল না বললে হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের আগেও এই গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। জনৈক সুধীর চক্রবর্তীর চেষ্টায় চরকা-কাটা, তাঁত-চালানো ইত্যাদি কাজ সেখানে কিছুদিন আগে থেকেই সুরু হয়েছিল। অসহযোগের সময় ছাত্ররা দু-একদিনের জন্য স্কুলে যাতায়াত বন্ধও করেছিল এবং বুড়ুল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি যাতে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে তারও চেষ্টা হয়েছিল শোনা যায়। আসলে, একটা কিছু করতে হবে এই ছিল তরুণদের অন্তরের কামনা, কিন্তু কী যে তাদের কর্তব্য সে সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাই

ছিল না। অনুরূপচন্দ্র যেন উপযুক্ত হাতিয়ার পেয়ে গেলেন। এখানকার লোকেরা তাঁকে দেখলো এক খর্বকায়, শান্ত, নিরীহ ভদ্রলোক—কর্তব্যনিষ্ঠ, ছাত্র বৎসল, ধর্মপরায়ণ। অজ্ঞ গ্রামবাসীরা শিক্ষিত ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে প্রীত হলেন। ছাত্রেরা তাঁর মাঝে পেয়ে গেল এক উৎসাহী তরুণ শিক্ষককে যাঁকে সম্ভ্রম করা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু পরমাত্মীয় মনে করতেও যাঁকে বাধে না। অনুরূপচন্দ্র ছাত্রদের প্রথমত শিক্ষক হিসেবেই আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন মনে হয়। প্রাক্তন প্রভাস রায় তাঁর প্রথম দিনের ক্লাশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

'আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমানের সপ্তম শ্রেণী) পড়ি। স্কুলে গিয়েই শুনলাম নূতন মাস্টার মশাই এসেছেন। লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম ; একজন বেঁটে-খাটো রোগা মানুষ অন্যান্য শিক্ষকদের মাঝে বসে আছেন। চোখদুটো তাঁর খুব উজ্জ্বল। বয়স একুশ বা বাইশ হবে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলুম যে অতো কম বয়সের মানুষ কখনই শিক্ষক হতে পারেন ? এর চার পাঁচ মিনিট পরেই ক্লাশ সুরু হবার ঘণ্টা পড়লো। যাঁকে আমরা শিক্ষক বলে ভাবতেই পারিনি দেখতে না দেখতে একটা ইংরেজি কবিতার বই নিয়ে তিনিই আমাদের ক্লাশে এসে উপস্থিত হলেন **Ethereal Sky** নামক কবিতাটি তিনি আমাদের পড়ে ব্যাখ্যা করতে বললেন। বছরের প্রথম তখন সবেমাত্র ক্লাশ সুরু হচ্ছে। কবিতাটিতে এমন অনেকগুলি কঠিন বাক্যে ছিল যেগুলির অর্থ আমরা তখন কেউই জানতাম না। তিনি প্রথমেই আমাদের কঠিন শব্দগুলির অর্থ, খাতায় লিখে নিতে বললেন। তারপরই ঐ কবিতাটি তিনি বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর পড়াবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ক্লাশ শেষে ঘণ্টা পড়লে তিনি লাইব্রেরী ঘরে চলে গেলেন।

"এর আগে এতো ভালো ইংরেজি পড়ানো আমরা শুনিনি। তিনি আমাদের স্কুলে ইংরেজি পদ্য, গ্রামার, ট্রানস্লেশন ও কম্পালশারি ম্যাথামেটিকস পড়াতেন। সমস্ত বিষয়েই তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি শুধু আমাদের ক্লাশ নয়, স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও মন জয় করে ফেললেন।"

ছাত্রদের নিয়ে তিনি 'আদর্শ ছাত্র সমিতি' নামে একটি ডিবেটিং সোসাইটি গড়ে তুললেন। প্রায় প্রতি শনিবার স্কুলের ছুটির পর ঐ সোসাইটির পরিচালনায়

আলোচনা সভা হতো। তিনি প্রতিটি সভায় যোগ দিতেন। মাঝে মাঝে অন্য শিক্ষকরাও আসতেন! প্রয়াত প্রভাস রায়ের কাছ থেকে জানা যায়, এইসব আলোচনা সভায় দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ধর্মীয় ও দেশাত্মবোধক সাহিত্য কবিতা আলোচিত হতো। সুরু হলো সাধনা নামে এক হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা যাতে তিনি নিজে, অন্য দুচার জন শিক্ষক এবং ছাত্রেরা লিখতেন। মাসিক চাঁদার প্রবর্তন করে কিছু টাকা উঠতো। তাই দিয়ে তিনি দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও নেতাদের জীবনী কিনে পড়াতে সুরু করলেন। এইভাবে বিদেশে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, ডি. ভ্যালেরা এবং স্বদেশের ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বসু, বাঘা যতীন প্রভৃতি শহীদদের জীবনী এবং স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনী দত্ত, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন কথার সঙ্গে তিনি ছাত্রদের পরিচয় ঘটালেন। এ ধরনের ছাত্র সংগঠন সে যুগের এ জেলায় আর কোথাও ছিল বলে আমাদের জানা নেই, থাকলেও তা অতি বিরল। শ্রীপ্রভাস রায় আরও বলেছেন—

"এক অপরিসীম মমত্ববোধ ও ভালোবাসায় তিনি ছাত্রদের ঘিরে রেখেছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর এমন অগাধ স্নেহ ভালোবাসা ছিল যা দুর্লভ জননী স্নেহের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কোনও ছাত্রের অসুখ শুনলেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি তাকে দেখতে যেতেন, তার বিছানার পাশে বসে স্নেহভরে গায়ে হাত দিয়ে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব করাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু লেখাপড়া বা কর্তব্যে অবহেলা দেখলে তিনি অসম্ভব কঠোর হয়ে পড়তেন তখন কেউ সাহস করে তাঁর কাছে যেতে পারতো না, ছাত্ররা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করতো। কুসুমের মতো পেলব কোমলতা ও বজ্রের মতো কঠোরতা একই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মধ্যে মিশে ছিল।

অনুরূপচন্দ্রের এইসব কাজকর্ম ও নির্দেশনার পিছনে দুটি বড়ো উদ্দেশ্য কাজ করছিল বলে মনে হয় : এক. ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রবল গড়ে তোলা, দুই. তাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করা। এইভাবে তাঁর সংস্পর্শে, প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লোকচক্ষুর অন্তরালে বুড়ুল স্কুলের একদল ছাত্র ও কতিপয় যুবকদের নিয়ে ঐ গ্রামে একটি গোপন বিপ্লবী দলেরও প্রতিষ্ঠা হলো, যার লক্ষ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে দেশের মুক্তি। দলটিকে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, তাই তিনি তৈরি করলেন পল্লী হিতৈষিণী সমিতি নামে

একটি পল্লী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির মধ্য দিয়েই শরীর চর্চার জন্ম ক্লাব, লাইব্রেরি, অনাথ ভাণ্ডার ইত্যাদি পরিচালিত হতে লাগলো, এবং এদের আড়ালে গড়ে উঠতে লাগলো একটি বিপ্লবী সংগঠন। এই সংগঠন প্রধানত যুক্ত ছিল চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও অনুরূপ সেনের নেতৃত্বে গড়ে তোলা বিপ্লবী দলের সঙ্গে। ফলে গণেশ ঘোষ, জুলু সেন, অনন্ত সিং এরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বুড়ুল গ্রামে ১৯২২—২৩ সালে। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ১৯২৩ সাল থেকেই আবার নতুন করে বিপ্লবী নেতারা তাঁদের বিপ্লবী কার্য-কলাপ স্থরু করে দেন। এই উপলক্ষ্যেই বাংলাদেশের বিপ্লবীদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী আত্মগোপন করে ১৯২৪ সালে বুড়ুল আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বিপ্লবীদের আর এক শ্রদ্ধেয় পুরুষ অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও অনুরূপচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। উভয়ের কাছেই অনুরূপচন্দ্র ছিলেন অতিশয় প্রিয়পাত্র। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও কলকাতায় গিয়ে মাস্টারদা, বিপিনদা, জ্যোতিষ ঘোষ এবং বরানগরের খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের যেসব কেন্দ্র ছিল সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

বুড়ুল গ্রামে আগে থাকতেই চরকা কাটা, তাঁত চালানো ইত্যাদি কাজ চলছিল, আস্তে আস্তে সেগুলি বিদায় নিল, বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজেই সমিতির অনেক ছেলে আত্মনিয়োগ করলো। এই কাজে যাঁরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন প্রভাসচন্দ্র রায়, কানাইলাল হাজরা (পরে চলে যান পণ্ডিচেরী আশ্রমে), ভূতনাথ ঘোষ, মুরারিসাধন চক্রবর্তী, সন্তোষ-কুমার চক্রবর্তী (অধ্যাপক), বিনয় রায় (পণ্ডিচেরি), সত্যেন মণ্ডল (কালো) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কানাই হাজরা ১৯২৩ সালে বুড়ুল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন, তিনিই এর পর থেকে কলকাতায় বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আর প্রয়াত প্রভাস রায় বলেছেন, "আমি স্থানীয় বিপ্লবী দল গড়ার কাজে মাস্টার মহাশয়ের প্রধান সহায়ক রূপে কাজ করতাম। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে জুলু সেন, অম্বিকাদা, লোকনাথ বল, বিপিনদা ও অনুকূলদা (রডা পিস্তল কোম্পানি থেকে পিস্তল লুঠের নেতা) সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।

এই প্রসঙ্গে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন প্রয়াত স্থরেশচন্দ্র ঘোষ যাঁকে সবাই 'ভুঁটিদা' বলে ডাকতেন। ইনি ছিলেন পল্লী

হিতৈষিণী সমিতির প্রাণস্বরূপ, অস্ত্রশস্ত্রের খবর ইনিও হয়তো কিছুটা রাখতেন, কিন্তু তার ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ জড়িত ছিলেন না। অনুরূপচন্দ্র ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠদের কাছে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "আমিও ইংরেজদের তাড়াতে চাই, দেশ স্বাধীন করতে চাই। সশস্ত্র বিপ্লব দিয়েই এ কাজে করতে হবে। হয়তো অতোটা সাহস নিয়ে আমি এগোতে পারব না কিন্তু সে কাজে বাধারও সৃষ্টি করবো না। বরং যতটা পারি সাহায্য করবো।" তিনি তাঁর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। অনুরূপচন্দ্র তাঁর ওপর সমিতির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। যতোদিন সম্ভব ছিল ততোদিনই তিনি এর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এক সময় এই সমিতিতে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হওয়ায় তিনি সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তার দুতিন বছর পরে বেশ কষ্টের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করে জীবনাবসান করেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বিপ্লবী সুলভ সতর্কতার সঙ্গে অনুরূপচন্দ্র লোক নির্বাচন করতেন, যে লোক যে কাজের উপযুক্ত তাঁকে সেই কাজেই নিযুক্ত করতেন। আবার নিজেকেও তিনি যে যেমন ভাবে চাইতো সেই ভাবেই তুলে ধরতে জানতেন। এ ছিল তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। অনন্ত সিংহ ও লিখেছেন "সেই সময় (যখন, তিনি বুড়ুল ইস্কুলের শিক্ষক) লক্ষ্য করেছি তাঁর বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও প্রতিভা, ইস্পাতের মতো দৃঢ়তা অথচ মানুষকে বশ করাবার অসীম ক্ষমতা।" সব দিক থেকেই কোনো সন্দেহের অবকাশ তিনি রাখেননি।

একজন সার্থক বিপ্লবী শুধু বিপ্লবী হিসেবেই আদর্শ স্থানীয় নন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার একজন সম্পূর্ণ মানুষও, অনুরূপচন্দ্রের মধ্যেও আমরা অসংখ্য মানবিক গুণের এক বিচিত্র সমাবেশ দেখতে পাই। অসামান্য ছিল তাঁর চরিত্র মাধুর্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পল্লী হিতৈষিণী সমিতি প্রথম দিকে ছাত্রদের নিয়েই কাজকর্ম করতো। পরে স্থির হয়, সহানুভূতিসম্পন্ন সাধারণ লোকদেরও সমিতির মধ্যে গ্রহণ করা হবে। মোটের উপর এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে একটা ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, এবং সেটাই স্বাভাবিক। অনাড়ম্বর বেশভূষা, সহজ সরল জীবনযাপন, দরিদ্র মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ—এগুলি তাঁর চরিত্রে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। সেই সময় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কে একটা প্রবল উন্নাসিকতা দেখা যেতো। কিন্তু অনুরূপ-

চন্দ্র এসব সংকীর্ণতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ছিলেন। যে স্কুলের তিনি শিক্ষকতা করতেন তার ঠিক পরেই ছিল সর্দার (ক্যাওরা) পাড়া গ্রামের সবচেয়ে উপেক্ষিত ও শোষিত অন্ত্যজদের পাড়া। অনুরূপচন্দ্র বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে বেছে নিলেন নিজের আসন। আজও তথাকথিত ভদ্রলোকদের মধ্যে এদের সম্পর্কে কিছুটা সংকোচের ভাব বিদ্যমান। আর হয়তো এই কারণেই অনুরূপ চরিত্রের এই দিকটি উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি। আজও দেখা যায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে তপশিলী সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছেই অনুরূপচন্দ্রের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। মনে রাখতে হবে, গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন তখনও সারাদেশে ভালো করে সুরু হয়নি, আর সাম্যবাদের আদর্শ তখন দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হয়তো বিবেকানন্দের বাণীই এঁদের সম্পর্কে অনুরূপ-চন্দ্রকে বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছিল, সঙ্গে ছিল তাঁর সহজ সরল সংবেদনশীল মন। সত্যিই তিনি এঁদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত অবহিত ছিলেন।

এ কথা ঠিক যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর ওপর বেশ গভীর ভাবেই পড়েছিল। তিনি প্রায়ই স্বামীজির রচনা থেকে আবৃত্তি করে, শোনাতেন "হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী। ভুলিও না, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" এইসব আবৃত্তির পর তিনি বলতেন ইংরেজরা দেশকে শাসন ও শোষণ করে গরীব করে রেখেছে। এই দেশকে স্বাধীন করার পর দেশের সাধারণ গরীব মানুষেরা যাতে অর্থ নৈতিক সামাজিক স্বাধীনতাও পায়, যাতে সব রকমে তাদের উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মানেই যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তা অবশ্যই নয়, কিন্তু বিশেষ করে গরীবদের জন্য যে স্বাধীনতা প্রয়োজন এটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন এবং বারবার সে কথা বলতেন।

প্রয়াত প্রভাস রায় বলছেন, "জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি আমাদের বিদ্রোহ করতে বলতেন।" তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯২৩ সালের শীতকালের কথা। সমিতি ভবনের দক্ষিণ দিকে আছে একটা খাল আর খালের দক্ষিণে একখণ্ড পতিত জমি। সেই জমিতে বুড়ুল গ্রামেরই ব্যগ্রক্ষত্রিয় (বাগ্‌দি) সম্প্রদায়ের একটা বুড়ো লোক সাধু হয়ে একটি ছোট্ট আশ্রম বানিয়ে বাস করতেন এবং সেখানেই হোম জপতপ নিয়ে দিন কাটাতেন, খাওয়া জুটতো গ্রাম-গ্রামান্তরে

ভিক্ষে করে। লোকটি ছিলেন খুবই সৎ। রক্ত আমাশয়ে ভুগে ভুগে একদিন তিনি মারা গেলেন। এখন তাকে পোড়ানো যায় কী করে, জাতে যে বাগ্‌দি। প্রভাসবাবু এবং তাঁদের 'ভুঁটিদা' অনুরূপচন্দ্রকে জানালেন যে সমিতির ছেলেরাই সাধুর শবদেহ দাহ করতে চায়। অনুরূপচন্দ্র খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। দাহকার্য সম্পন্ন করে ছেলেরা দল বেঁধে ঘোষবাবুদের পুকুরে স্নান করে যে বার বাড়ি চলে গেল। এই নিয়ে রায় এবং ঘোষ কর্তাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল, স্থির হলো পরের দিন সকালে ঘোষবাবুদের সদরে সকলের বিচার হবে। সেদিন সকালে সত্যিসত্যিই পাইকান গ্রাম থেকে পূর্ণ ভট্টাচার্য মশাইকে আনানো হলো। বিধান দেওয়া হলো "আমাদের নাকি মুখে তুষাগ্নি করতে হবে। আমরা মাস্টার মশায়ের কাছে পরামর্শ নিতে গেলাম। তিনি আমাকে ও ভুঁটিদাকে বললেন "তোমরা কোনও অন্যায় কাজ করোনি যা করেছো তা ঠিকই করেছো। অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবে না। তাই ডাকলে তোমরা যাবে না। আমাদের বিচারের জন্যে ডাক পড়লেও আমরা গেলাম না। সেদিন আমরা বাড়িতে খেতেও গেলাম না। আমরা সেদিন আমাদের সকলের মাসিমা নিস্তারিণী দেবীর বাড়িতে খেতে গেলাম। (অনুরূপচন্দ্র নিজেও ঐ বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন) কর্তাবাবুরা যখন বুঝলেন যে ছেলেদের দাবানো যাবে না তখন তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ঐখানেই ঐ বিষয়ের যবনিকাপাত ঘটে।

এই ছিল অনুরূপ চরিত্রের একটি দিক। অন্যদিক অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজে দিন কাটাতেন। সামান্য ধুতি চাদরেই তাঁর চলে যেতো। প্রায়ই বলতেন, খিদে তার পায় না, খেতে হয় তাই খান। শিক্ষকতা করে যে বেতন পেতেন তা থেকে তিনি নিজের খাওয়া পরার নিম্নতম খরচটুকু বাদ দিয়ে বাকি সব টাকাই বিপ্লবী দলের কাজে ব্যয় করতেন। কখনো-সখনো কোন সাহায্যার্থী এলে তাঁকে অকাতরে সাহায্য করতেন। এ ব্যাপারেও প্রয়াত প্রভাস রায় একটি ছোট্ট কাহিনী বিবৃত করেছেন। একদিন সন্ধ্যার পর অনুরূপচন্দ্রের বাসায় গিয়ে দেখেন টেবিলের ওপর এক খোলা চিঠি। জিগ্যেস করে জানলেন এটি লিখেছেন অনুরূপচন্দ্রের এক বিধবা দিদি যিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। দিদি লিখেছেন, অনুরূপ শুনেছি তুমি খুব দয়ালু। তোমার এই গরীব দিদিকে কি ভুলে থাকবে ? আমাকে কি কিছু সাহায্য করতে পারো না ? অনুরূপ-চন্দ্র তাঁর ছাত্রকে জিগ্যেস করলেন কী করা উচিত বলো তো ? ছাত্র জানালেন

আপনার দিদির জন্যে মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমার দিদির মতো লক্ষ লক্ষ বিধবা কতো কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের কে দেখবে বলোতো। এঁদের বাঁচাবার জন্যেই তো আমরা দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করছি।" শেষ পর্যন্ত ছাত্রের অনুরোধে তিনি বিধবা দিদিকে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠাতে লাগলেন।

উত্তরবঙ্গের বন্যার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি ত্রাণ ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। অনুরূপচন্দ্র ছেলেদের নিয়ে বেরলেন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা চাইতে। বন্যার করুণ কাহিনী বর্ণনা করে নিজেই গান রচনা করলেন। মুখের হাসি বজায় রেখে সে সময় সব কাজেই তিনি ছেলেদের উৎসাহিত করতেন। একবার তিনি প্রায় চারদিন অর্ধাহারে থাকার পর রাত্রে আট মাইল পথ অতিক্রম করে প্রত্যুষে স্কুলে নিয়মিত ক্লাশ করেছিলেন। তাঁর কর্তব্যচ্যুতি কেউ কোনদিন দেখেনি।

সংযম জিনিসটার ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো সে সময়। অনুরূপ-চন্দ্রের বিশ্বাস ছিল কঠোর সংযমের মধ্যে দিয়েই মহা কাম্য বস্তু লাভ করা যায়। শোনা যায় একবার গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের সদর বাড়িতে (কাচারি) তিনি যখন একাকী বাস করছেন সে সময় জনৈক সুন্দরী মহিলা একান্তে তাঁর কাছে কিছু গোপন প্রস্তাব নিয়ে আসেন। উত্তরে তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে প্রকাশ্যে চিৎকার করে যে ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন তাতে এরকম ঘটনা আর দ্বিতীয় বার ঘটতে পারেনি। শয়ন নিদ্রা আহার ভ্রমণ সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর অভ্যাস ছিল সংযত ও নিয়মিত। ছেলেদেরও তিনি সেই আদর্শেই গড়ে তুলতে চাইতেন। ভোরবেলা ছেলেরা যাতে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করে তার জন্যে তিনি নিজে তাদের ডেকে দিতেন। সমবেত ধর্মচিন্তার সুবিধের জন্য তিনি সমিতির মধ্যে একটি ছোটো ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেও ধর্মানুরাগ অনুরূপ চরিত্রের একটা মস্ত দিক ছিল। অন্তরে গোপন তলে যে বৈরাগী বাউলটি একদিন ছোটবেলায় তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল সেই আবার তাঁকে এই শান্ত পল্লী প্রকৃতির স্তব্ধ কোণে ধ্যানে বসবার ইঙ্গিত জানাতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নির্জন স্থানে স্তব্ধ হয়ে একলা সময় কাটিয়েছেন। কখনো বা আকাশপ্লাবী জ্যোৎস্নার নিচে গভীর আবেগের

সঙ্গে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন—"দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না।" সমবেত অথবা একাকী প্রার্থনায় অনেক সময় তিনি নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলতেন। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে যখন তিনি শ্রীঅরবিন্দের রচিত দুর্গাস্তোত্রটি পাঠ করতেন তখন কেউ আর মুগ্ধ না হয়ে পারতো না।

ক্রমশ তাঁর প্রাণে ধর্মপ্রেরণা প্রবল হয়ে উঠলো। এক সময় শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্যে তিনি কলকাতায় আসেন তখন পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামের ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ আলেচনা হয় বলে শোনা যায়। পরে অবশ্য তিনি শ্রীঅরবিন্দকেই গুরুত্বে বরণ করেন। বুড়ুল গ্রাম থেকে মাইল-চারেক দক্ষিণে মালা নামক গ্রামে চারুচন্দ্র দেব সরকার ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য—নিজ গ্রামে সাধনাশ্রম করে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনুরূপচন্দ্র সেখানে ১৯২৫ সালের প্রথম দিক থেকেই যাতায়াত শুরু করেন। নিজের ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের তিনি সেখানে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। প্রধানত চারুবাবুর সংস্পর্শে এসে তিনি ক্রমশ শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রেরও কিছু আদান-প্রদান হয়। এক এক সময় অনুরূপচন্দ্র একান্তই অধৈর্য হয়ে উঠতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রতিকৃতি চেয়ে পাঠান।

বোধহয় ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে অনুরূপচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো অনুরূপচন্দ্র ফটো তোলানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। হয়তো বিপ্লবী কাজে আত্মগোপনের কারণেই এই অনিচ্ছা, তা ছাড়া নিজেকে অনাবশ্যক বাইরে জাহির করায় ছিল তার ঘোর অপছন্দ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে ফটো তোলাতে বাধ্য হলেন তিনি। কলকাতায় পরিচিত এক আলোকচিত্র শিল্পীর স্টুডিওতে তিনি যে ফটো তোলান তার তিনটি কপির মধ্যে একটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পণ্ডিচেরিতে পাঠানো হয়, অন্য দুটি তাঁর বাক্সের মধ্যে লুকানো ছিল একথা বিশেষ কেউ জানতো না। মৃত্যুর পর সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। (আদিতে এগুলি ছিল খালি গায়েরই ফটো বর্তমানে যে চাদর জড়ানো চেহারা দেখা যায় এটি পরবর্তী কালে কোনো শিল্পীর কাজ)। শেষ জীবনে অনুরূপচন্দ্রের আর একটি ফটো তোলা হয় তাঁর মুক্তির পর, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, দেহ আক্ষরিক অর্থেই কঙ্কালসার। প্রয়াত প্রভাস রায় জানাচ্ছেন যে "শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও ঐ ধর্মজীবন যাপনের প্রতি

আমাদের তখনই আকৃষ্ট না হতে বলতেন। বলতেন যে তখনও আমাদের ওপথে যাবার সময় হয়নি। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্প যেমন গ্রহণ করলাম তেমনি মুরারিশরণ চক্রবর্তী, সন্তোষ চক্রবর্তী প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবী দল গড়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। এমনিভাবে যে উদ্দেশ্যে অনুরূপচন্দ্রের বুড়ুল অবস্থানের সিদ্ধান্ত সে উদ্দেশ্যও ধীরে ধীরে সফল হয়ে উঠতে লাগলো। বুড়ুল থেকেই অনুরূপচন্দ্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন কার্যকলাপের খোঁজখবর রাখতে লাগলেন। একথা আমরা আগেই বলেছি। বুড়ুল গ্রাম সেদিন বিপ্লবীদলের একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

গ্রামের পশ্চিম দিকে গঙ্গার তীরে বিপ্লবীদের ছিল প্রধান আড্ডা। ওখানে ওদের মন্ত্রণাসভা বসতো। কিন্তু একটি সংবাদ বড়ো কৌতুকজনক। প্রয়াত প্রভাস রায় বলছেন "মস্তিক পরিচালনার কাজে মাস্টার মহাশয় চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হলেও অস্ত্র পরিচালনা বিষয়ে বোধহয় তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা ছিল না। অনন্ত সিংহও জানাচ্ছেন—মাস্টারদা বা অনুরূপদা—কেউই তখন অস্ত্রচালনায় খুব দক্ষ ছিলেন না। শারীরিক নয়, মানসিক শক্তির জোরেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন—বিপ্লবের পথে অটল ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন "আগ্নেয়াস্ত্রের বিপজ্জনক ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুরূপদার সঠিক উপলব্ধি ছিল না আর এই (অস্ত্র ব্যবহারের) নিয়মটাও জানতেন না। ফলে একবার কি বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনাও অনন্ত সিংহের বই-এ লিপিবদ্ধ আছে। এই বর্ণনা মূলত সঠিক হলেও দু-একটা ছোটোখাটো বিষয়ে কিছু ভুল রয়ে গেছে বলে আমাদের ধারণা। প্রয়াত প্রভাস রায়ের বর্ণনা সেদিক থেকে সম্ভবত আরো নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেছেন—

১৯২২ বা ২৩ সালের কথা। একদিন স্কুল থেকে ফিরে স্বর্গীয় বরদা কোঙার মহাশয়ের ডাঙায় স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে গেলে তিনি অনন্ত সিংহ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—আজ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। পিস্তলের গুলি ভরা ছিল। হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে গুলি ছুটে গেল। দেখলাম গুলি তাঁর বিছানা ও তক্তাপোষ ভেদ করে চলে গেছে। অবশ্য তাঁর বা অনন্ত সিংহ-এর গায়ে লাগেনি। তারপর অনন্ত সিংহ আমাকে পিস্তলের কায়দা কৌশল শিখিয়ে দিলেন। প্রয়াত অনন্ত সিংহ বলেছেন যে পিস্তলের শব্দ থেকে বিপদের বিশেষ

কারণ ছিল এই যে কাছেই ছিল পুলিশের থানা। আসলে থানা ছিল বজবজে—বুড়ুল থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। বুড়ুল গ্রামকে কেন্দ্র করার সুবিধেই ছিল এটা। মোটের ওপর অনুরূপচন্দ্রকে দীর্ঘকাল কেউ বিশেষ সন্দেহ করতে পারেনি। তিনিও ঐ গুপ্তকেন্দ্র থেকে নানাভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করে চললেন।

বিপ্লবী কাজকর্মের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো একটা উপযুক্ত আড়াল সৃষ্টি করা। শিক্ষকতা ও অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মের পিছনে সম্ভবত তাঁর ঐ আড়াল সৃষ্টি উদ্দেশ্য কাজ করছিল। এ ব্যাপারে তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। সঙ্গে মিশেছিল তাঁর অসামান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আমতলার নিকটবর্তী জয়রামপুর গ্রামে শিবচৈত্র মেলায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হতো। কিন্তু মন্দিরের কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্যে কোন সুব্যবস্থাই করতেন না। ১৯২৩ সাল থেকে অনুরূপচন্দ্র বুড়ুল ইস্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠিত দেড়শ-দুশো জনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে সেখানে সেবাকার্য করতে যেতেন। তিনদিন ধরে তাঁর ও অন্যান্যদের আহার থাকলেও নিদ্রার সুযোগ থাকতো না। মেলার পর ছেলেদের এক-আধদিন ইস্কুল কামাই হতো। কিন্তু অনুরূপচন্দ্র সারা পথ হেঁটে যথা সময়েই ছাত্র পড়ানো সুরু করতেন।

ঠিক তেমনি ছিল হিতৈষিণী সমিতিকে ঘিরে তাঁর নানামুখী দৈনন্দিন কাজকর্ম—এসব কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। তাছাড়া বুড়ুলে তাঁর অবস্থানকালে উক্ত সমিতির আহ্বানে প্রতি বছর অন্তত একটি করে জনসভা অনুষ্ঠিত হতো। সেই জনসভায় সাধারণতঃ কলকাতা থেকে কংগ্রেসের নেতারা আসতেন। অনুরূপচন্দ্র সেখানে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর প্রাঞ্জল ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। একদিকে অপূর্ব ছিল তাঁর বাগ্মিতা, অন্যদিকে অসামান্য ছিল তাঁর রচনাদক্ষতা। এমনকি হাতের লেখাটিও ছিল অতি সুন্দর। প্রভাস রায় তাই লিখেছেন "সবকিছু জড়িয়ে তিনি ছিলেন একজন সর্বজ্ঞানগুণসম্পন্ন মানুষ।" অনন্ত সিং ও দেখেছিলেন, "গ্রামের যুবকরা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত।" তিনি আরও বলেছেন, "বুড়ুল গ্রামের বহু গৃহস্থের গৃহকোণ তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষণের কেন্দ্র ছিল।" এ তথ্য আজ পুরোপুরি যাচাই করা কঠিন, তবে সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাঁর সমস্ত কৌশলের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে লোকচক্ষুর একান্ত সামনে থেকেই তিনি তাঁর যাবতীয় গোপন কাজ পরিচালনা

করে গেছেন। সমিতি ছিল একযোগে তাঁর রাজনীতি প্রচারের, জনসংযোগের, আড়াল সৃষ্টির এবং কর্মী সংগ্রহের কেন্দ্র। প্রভাস রায় আরও বলেছেন, যখনই কেউ পল্লী হিতৈষিণী সমিতি ও বুড়ুল ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের (ফুটবল ক্লাবের) অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলবার চেষ্টা করেছে তখনই তিনি তাঁর ছাত্র ও স্থানীয় চারটি গ্রামের যুবক ও ঐ প্রতিষ্ঠান দুটির শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর অবর্তমানেও তাঁরা ঐ প্রতিষ্ঠান দুটিকে রক্ষা করেছেন।"

ইতিমধ্যে দেশের চারিদিকে নানা জায়গায় নানা ভাবে বিপ্লবী কাজকর্মের একটা বিরাট উদ্যোগ পর্ব চলছিল। সরকারও চুপ করে বসে ছিল না। ১৯২৪ সালে জারি হলো 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স'। ফলে শুধু বিপ্লবীরাই নয় বহু নেতৃস্থানীয় সাধারণ লোকও দলে দলে কারারুদ্ধ হতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারাও কারাগারের বাইরে রইলেন না।

বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। একে বিপ্লবীরা প্রথম থেকেই নানা ছোটখাটো দলে বিভক্ত, তার ওপর ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে নেতৃত্বের একান্ত অভাব ও বিভিন্ন দলের তরুণ কর্মীরা এই সংকট মুহূর্তে এক সম্মিলিত 'ফ্রণ্ট' গঠন করবার প্রস্তাব করলেন। অনুরূপচন্দ্র এই মিলনের প্রস্তাবকে কার্যকর করবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। শেষ পর্যন্ত একটা নতুন দল গঠিত হল। সমস্ত ঘটনার সাক্ষ্য আজও যাঁরা দিতে পারেন তাঁরা জানেন এই সময় অনুরূপচন্দ্রের প্রচেষ্টা কতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অথচ আশ্চর্য এই বিপ্লবী দলের এতো বড়ো একজন নেতা সূর্য সেনের এই ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীর নামটুকু পর্যন্ত দীর্ঘকাল কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথমত, বিপ্লবীদের আসল কাজকর্ম ছিল একান্ত গোপন, কাজ করতে গেলে মন্ত্রগুপ্তির ছিল একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অনুরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। নিজে প্রকাশ্যে লোকচক্ষের সামনে থেকেও আত্মপ্রচার তিনি সযত্নে পরিহার করে গেছেন। তাঁর সহকর্মীরাও তাঁকে সঠিকভাবে চিনতেন, তাঁর কর্মক্ষমতাকে তাঁরা নির্ভুলভাবেই বিচার করেছিলেন। অনুরূপচন্দ্র নিজেও কোনদিন কোনও অভিযোগ করেননি। যা তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম তা তিনি তাঁর সমগ্র সাধ্য দিয়ে আমরণ সাধন করে গেছেন মুখ বুজিয়ে। তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার বিপ্লবের দুবছর আগে।

সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যাঁরা তাঁদের নামই লোকের কাছে পরিচিত। অনুরূপচন্দ্র তাই রয়ে গেলেন বিস্মৃতির অন্তরালে। "বিপ্লবের সমস্ত আয়োজন অসম্পূর্ণ রেখে নিঃশব্দে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—অনন্ত সিংহের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।

প্রভাস রায় জানাচ্ছেন :

"১৯২৪ সালের প্রথম দিকে সময়ে একদিন তিনি কলকাতা থেকে এসে আমায় বললেন সে চট্টগ্রামে তাঁর দলের ছেলেরা অস্ত্র কেনার জরুরি প্রয়োজনে একটা ঘোড়ার গাড়ি থেকে ইংরেজ সরকারের বেলের আঠারো হাজার টাকা লুট করেছে। তিনি বললেন যে, ইংরেজ সরকার হয়তো তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। গ্রেপ্তার করলেও আমাদের দলের কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। এই ঘটনার দু-এক মাস পরে কোলকাতার শাঁখারিপাড়া (লেবুতলার দক্ষিণে পাড়া) পোস্ট অপিসে ডাকাতি করে বিপ্লবীরা অস্ত্র কেনার জন্য কয়েক হাজার টাকা জোগাড় করেছে। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার ঘটনা ও টেগার্ড সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে গোপীনাথ সাহার ধরা পড়ার কথা তিনি আমাকেও কানাই হাজরাকে বললেন এবং সতর্কতার সঙ্গে বিপ্লবী দলের কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে বললেন।"

কিন্তু সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির সামনে বিপ্লবীদের নতুন উদ্যম ও আরও বেশি দূর কার্যকর হতে পারলো না। দিনের পর দিন এতো বেশি লোক গ্রেপ্তার হতে লাগলো যে কোন পরিকল্পনাই আর সফল হয়ে উঠতে পারছিল না। একবার নাকি হাওড়ার ব্রীজটাকে (বর্তমান ব্রীজ নয়, পুরনো ভাসমান ব্রীজ) বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবে সফল হতে গেলে অন্তত চারজনের জীবনান্ত ঘটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপচন্দ্র এই চারজনের মধ্যে নিজের নামটিকে পেশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্য ক'জন গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে এ পরিকল্পনাকে আর কার্যকর করা যায়নি।

এমনি সময়ে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারের সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়লো (১৯২৫ খৃঃ)। বলা বাহুল্য, অনুরূপচন্দ্রের নামও এসব ব্যাপারে জড়িত ছিল। পুলিশ কেমন করে যে অনুরূপচন্দ্রের নামটা খুঁজে বের করলো তা আজও অজ্ঞাত। বহুদিন পরে ১৯২৬ খৃস্টাব্দে ১৯ ডিসেম্বর রবিবার সকালে দেখা গেল তাঁর শয়নগৃহ পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত। অনুরূপচন্দ্রের বিরুদ্ধে

নির্দিষ্ট কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। খানাতল্লাশিতে তাঁর কাছে আপত্তিকর কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গিয়েছিল তা শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানি পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঐ ১৯২৬ সালেই প্রভাস রায় বুড়ুল স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে আই.-এ পড়া শুরু করেন। অনুরূপচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পর তাঁকেও গ্রেপ্তার করার জন্যে পুলিশ কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করে, কিন্তু তিনি পুলিশের চোখ এড়িয়ে চকিতে কলেজ ত্যাগ করেন এবং বিশেষ বিশেষ কয়েক-জনকে সতর্ক করে দিয়ে কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করেন। এদিকে বুড়ুল ও তাঁর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অনুরূপচন্দ্রের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইংরেজ সরকার এবং সরকার সমর্থক স্থানীয় অধিবাসী যে দু-চারজন লোক ছিল তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। সংবাদ পেয়ে দিন-দুয়েক পরেই সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেন-ডেণ্ট ঘোড়ায় চড়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে গ্রামে আসেন এবং অভিভাবকদের মিটিং ডেকে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বললেন যদি তাঁরা তাঁদের ছেলেদের এই বিপজ্জনক পথ থেকে ফেরাতে না পারেন তা'হলে ছেলেদের, তাঁদের এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কপালে অনেক দুর্গতি আছে।

গ্রেপ্তারের পর অনুরূপচন্দ্রকে পুরো একমাস আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে নির্জন 'সেলে' আটকে রাখা হয়। তারপর তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয় জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়ি গ্রামে সহকর্মীদের অনেকেই সে সময় বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন, কেউবা ছিলেন তাঁরই মতো এদিক-ওদিক ছিটকে তাই সরকারি অতিথি হয়ে তাঁর দিনগুলি কেমন কেটেছিল তা জানবার বিশেষ কোনও উপায় নেই। অনুরূপচন্দ্রেরই লেখা একখানা চিঠিতে এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়।

এখানে বলে রাখা দরকার যে গ্রেপ্তারের বছর দুই আগে থেকেই অনুরূপচন্দ্র বুড়ুল গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের সদর বাড়িতেই থাকতেন এবং ঐ পরিবারের জনৈক নিস্তারিণী দেবীর বাড়িতেই খেতে যেতেন। ইনি ছিলেন সকলের মাসিমা। অনুরূপচন্দ্র তাকে 'মা' বলেই ডাকতেন। ময়নাগুড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকার সময় এই নিস্তারিণী দেবীকে অনুরূপচন্দ্র মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। এইসব চিঠিতে তিনি আকারে ইঙ্গিতে সকলের কথা জানতে চাইতেন, নিজের খবরও খুব সংক্ষেপে জানাতেন। প্রভাস রায় জানাচ্ছেন—

"তার চিঠি আসার খবর পেলেই ভুঁটিদা প্রভৃতি সমিতির ছেলেরা দল বেঁধে চিঠি পড়তে যেতো। আমরা যারা কলকাতায় থাকতাম সে খবর পেতাম। ১৯২৬ সালেই কানাই, বিনয়, ভূতনাথ, স্বরেন তখন অরবিন্দের ভক্ত হয়ে গেছে। কলকাতায় ও চট্টগ্রামে আমার পরিচিত যেসব বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন তাঁরাও গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। তখন মুরারি, সন্তোষ ও আমি বাইরে আছি। আমরা আবার বুড়ুলকে কেন্দ্র করেও কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে দলের কাজ চালিয়ে যেতে রইলাম।"

ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ম্যালিরিয়া এবং আমাশয় রোগে নিদারুণভাবে পীড়িত অবস্থায় অনুরূপচন্দ্রকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং কাশীতে পাঠানো হয়। এর পর শ্রীপ্রভাস রায় লিখেছেন—

"হঠাৎ ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে বারাণসীর রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে শহীদ অনুরূপ সেনের লেখা এক শেষ চিঠি বজ্রপাতের ন্যায় মসিমার কাছে এসে উপস্থিত হলো। আমি তখন কলকাতায়। সেই চিঠি পেয়ে জানতে পারা গেল যে বিনা চিকিৎসায় ময়নাগুড়িতে আমাশয়ে ভুগে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বারাণসীতে রামকৃষ্ণ আশ্রমে অন্তরীণ অবস্থায় পড়ে আছেন। ঐ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাসিমা মুরারিকে সঙ্গে নিয়ে কাশীধামে চলে গেলেন। সেই সময় আমার পরীক্ষা একেবারে কাছে এসে গেছে। আমি যাবার আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি ও কানাই আমায় যেতে বারণ করলেন। কারণ দুচার দিনের মধ্যে আমাদের আই.-এ. পরীক্ষা স্থরু হবে। আমি আর গেলাম না। আমায় যেতে বারণ করে কানাইও দুদিন পরে চলে গেল।

"বারাণসী থেকে মুরারি যে চিঠি পাঠান তা পড়ে আমরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বুঝলাম যে আমরা আর মাস্টারমশাইকে ফিরে পাবো না। কারণ তারা যে ভাবে নিয়ে গিয়েছিল তার জল পান করবার ক্ষমতাও মাস্টার মহাশয়ের ছিল না বললেই হয়। বিনা চিকিৎসায় রক্ত আমাশয়ে রোগে ভুগে ভুগে তাঁর নাড়ি পচে পচে তখন বার হচ্ছে। জল মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

এই ভাবে "জন্মভূমি কর্মভূমি উভয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দারুণ রোগে বিনা চিকিৎসায় এই মহান বিপ্লবীর জীবনাবসান হলো ১৯২৮ সালে ৩রা এপ্রিল। এ মৃত্যু তো আসলে শহীদেরই মৃত্যু। এ বিষয়ে শ্রীঅনন্ত সিংহ লিখছেন—আমরা জেলে বিনাবিচারে আটক থাকার সময় ১৯২৬ সালের শেষের দিকে তিনি কঠিন

রক্ত আমাশয়ে রোগে আক্রান্ত হন, ঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে গ্রামে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই তিনি মারা যান।" এই তথ্য পরিবেশনে ভুল আছে তিনটি। প্রথমত, তারিখের ভুল, দ্বিতীয়ত, স্থানের ভুল, তৃতীয়ত, তিনি অন্তরীণ অবস্থায় মারা যাননি, কাশীতে 'এক্সটার্নমেন্ট এর অবস্থায় মারা যান। ১৯২৮ সালে সত্যিই বাংলাদেশের আর এক তরুণ সূর্য অকালে অস্তমিত হলো। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন তাঁর 'মা' অর্থাৎ নিস্তারিণী দেবী আর তাঁর প্রিয় ছাত্র মুরারিশরণ চক্রবর্তী। ক্ষণজন্মা বিপ্লবী অনুরূপচন্দ্র সেন দুটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা। একটি চট্টগ্রামে; অন্যটি বুড়ুলে। চট্টগ্রাম তাঁকে ভুলেছে ভোলেনি বুড়ুল।

শহীদ সূর্য সেনের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মনোহর মুখার্জি

[শহীদ সূর্য সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থ মাস্টারদার আবক্ষমূর্তির সামনে ১৯৯৩ সনের ২২শে মার্চ ১০ ঘটিকায় যে সভা হয় তার সভাপতি মনোহর মুখার্জির ভাষণের সারাংশ :

—সম্পাদক]

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে মাস্টারদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে পাহাড় ও সমুদ্র ঘেরা একটি ছবির মত সুন্দর জায়গা চট্টগ্রাম। চট্টলার কথা বলতে গেলে যাঁর কথা প্রথম মনে পড়ে তিনি হলেন যাত্রামোহন সেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে তিনি যেমন বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন তেমনি স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সমাজসেবার মধ্য দিয়ে অকাতরে তা খরচ করে গিয়েছেন। সাহিত্য সম্মেলন করে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের চট্টগ্রামে নিয়ে গেছেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। বাংলার সর্বত্র সভাসমিতি করে চরমপন্থী বলে পরিচিত হন—বিশেষ করে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের মাধ্যমে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র যতীন্দ্রমোহন ; বার্মা অয়েল কোম্পানি এবং এ. বি. আর স্ট্রাইক পরিচালনা করতে গিয়ে নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেন। তিনি সস্ত্রীক স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে জেলেও যান। দেশের লোক ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁকে ট্রিপ্‌ল্ ক্রাউন (১. বি. পি. সি. সি.-র সভাপতির পদ, ২. বিধানসভার বিরোধী দলনেতার পদ, ৩. কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ) পরিয়ে দেয়। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্ত ৩১।৩।৩৩এ কলিকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৩এ যতীন্দ্রমোহন বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে শহীদের মর্যাদা পান।

তারপরই মনে আসে চট্টগ্রামে মাস্টারদার পূর্বসূরিদের কথা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সম্পর্কে বললে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯০৮

সনে যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯১৫ সনে যখন তিনি বাগনান স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন, তখন বাঘাযতীন ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে কয়েকদিনের জন্য সেখানে গোপনে থাকা ও পরে তাঁদের নির্বিঘ্নে বালেশ্বরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরেই তিনি ধরা পড়েন এবং স্টেট প্রিজনার হিসাবে জেলে থাকেন। মুক্তির পরে চট্টগ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের সভ্য হন এবং নন্‌কোঅপারেশন মুভমেণ্টে যোগ দেন।

ধোরলা গ্রামের নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যুগান্তর দলের সভ্য ছিলেন। ১৯১৬ সনের মে মাসে কলিকাতা ডিক্সন লেন বম্বকেসে চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

যুগান্তর দলের নরেন ঘোষচৌধুরীর সহকর্মী হিসাবে হেমচন্দ্র দাস নামে চট্টগ্রামের এক জমিদারের উল্লেখ পাই।

মাস্টারদা ১৮৯৪ সনে চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে আই. এ. পাশ করে ১৯১৬ সনে বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯১৮ সনে বি. এ. পাশ করেন। ওখানেই ১৯১৭ সনে তিনি যুগান্তর দলের প্রথম শ্রেণীর সংগঠক বাঘাযতীনের সহকর্মী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন এবং গুপ্ত যুগান্তর বিপ্লবীদলের সদস্য হন।

এই প্রসঙ্গে আমি সতীশদা সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত বলে মনে করি। সতীশদা খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে ১৯১০ সনে ম্যাট্রিক ও দৌলতপুর কলেজ থেকে ১৯১২ সনে আই. এ. পাশ করে বহরমপুর কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১৪ সনে বি. এ. পাশ করে ঐ বৎসরই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। বহরমপুর থাকা কালে তিনি সেখানে যুগান্তর দলের একটি সুন্দর সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১৫ সনে বালেশ্বর যুদ্ধের পর আমাদের বিপ্লবী দাদারা যাঁরা ডি. আই অ্যাক্ট এবং রেগুলেশন থ্রি-তে ধরা পড়েননি তাঁরা সবাই আত্মগোপন করেন। তাঁদের অন্যতম সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ হাওড়ার শালকিয়াতে বড় পিসিমাকে (ভোলানাথ চ্যাটার্জির পিসিমা) তাঁর একটি কিশোর নাতিসহ একটি বাড়িতে রেখে এক গোপন আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেন। অতুলদা, সতীশদা, যুগলদা (দত্ত) এবং আরও কয়েকজন ঐ বাড়িতে থাকতেন। একদিন রাতে ঐ বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলে। বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে পালিয়ে যেতে

চেষ্টা করেন। যুগলদা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রিভলভারসহ ধরা পড়েন। সতীশদা মাউণ্টেড পুলিশের লাথি খেয়ে একটা পুকুরের উঁচু পাড থেকে নিচে পড়ে যান। অন্ধকারে পুলিশ তাঁকে খুঁজে পায় না। আছাড়ের ফলে রিভলভার তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়। তিনি তা খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে পটাশিয়াম সায়েনাইড-এর ক্যাপস্থল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কয়েক ঘণ্টা পরে (সম্ভবত ওটা oxidised হয়ে গিয়েছিল) তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তিনি চন্দননগরে একটি আশ্রয়স্থলে যান এবং সেখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এক বলিষ্ঠ যুবক চিরজীবনের মত খানিকটা পঙ্গু হয়ে যান। এর পরে বহরমপুরে যান এবং তাঁর পূর্ব সহকর্মীদের সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকেন। সেই সময় (১৯১৭ সন) মাস্টারদা তাঁর সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে সতীশদা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং খুলনা থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভার সদস্য হয়ে আসেন।

বি. এ. পাশ করে মাস্টারদা চট্টগ্রামে এসে উমাতারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হন এবং বিপ্লবী সংগঠন গড়ায় মন দেন। তখন অম্বিকা চক্রবর্তী নগেন সেন, নির্মল সেন তাঁর সহকর্মী ছিলেন। পরে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হন।

যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা যাঁরা বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন ও নানা জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এই সময়ের একটি বড় ঘটনা তাঁদের দৃষ্টিতে আসে, সেটি হল ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী বক্তৃতায় (৪/২/১৬) গান্ধীজী ছাত্রদের উদ্দেশ্য বলেন, "আশা করি তোমরা বাংলার যুবকদের মত যাঁরা দেশের জন্য সবকিছু এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার নজির রাখছেন সেইরূপ দেশসেবার আদর্শ নিয়ে কর্মে লিপ্ত হবে।" কিছুদিন পরে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারেও তিনি অনুরূপ বক্তৃতা দেন। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তার বিরুদ্ধে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা নেন। আমেদাবাদ মিল স্ট্রাইকে (২২/২/১৮) তিনি শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বন করেন। চম্পারণে (৮/১১/১৭) তিনি কৃষকদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ করেন। ১৯২০ সনে যুগান্তর দলের মুক্তিপ্রাপ্ত ও আত্মগোপনকারী নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে

আলোচনার সময় গান্ধীজীর উপরোক্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেকেই বলেন, "এ তো আমাদেরই কাজ।" তার উপর গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ আন্দোলনে যোগ দিলে একটা Mass Contact-এর সুযোগও পাওয়া যাবে। তাই মোটামুটি ঠিক হয় যে যুগান্তর দল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে গান্ধীজীর নন্ কোঅপারেশন মুভমেন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে তাঁরা গান্ধীজীর কাছে পাঠান। তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন, "আপনার আন্দোলনে আমরা যোগ দিতে চাই। যতদিন এই আন্দোলনে থাকব ততদিন আপনার নির্দেশমত অহিংস থেকেই সংগ্রাম করে যাব। তবে এক বছর পরে আমরা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন বোধ করলে আবার নিজেদের পথে ফিরে যাব।" গান্ধীজী খুব খুশি হয়ে তাঁদের যোগদানে সম্মতি জানান এবং বলেন, "আমি আরও খুশি হতাম যদি তোমাদের মত সর্বস্বত্যাগী দেশসেবকদের আমার অহিংসার পথকে Creed হিসাবে গ্রহণ করাতে পারতাম।" ওখান থেকে ভূপেন্দ্র দত্ত ও জীবন চ্যাটার্জি পণ্ডিচেরী যেয়ে অরবিন্দকে তাঁদের পরিকল্পনা এবং গান্ধীজীর সাথে তাঁদের আলাপ-আলোচনার কথা জানান। অরবিন্দ এতে তাঁর সম্মতি দেন এবং নির্দেশ দেন যে সম্ভবমত তাঁরা যেন জেলায় জেলায় একটি দুটি ক'রে সমাজসেবী কেন্দ্র বা আশ্রম গড়ে তোলেন যাতে করে তাঁদের পায়ের তলার মাটি শক্ত থাকে। বরিশালের শঙ্কর মঠ তো পূর্বেই ছিল। তারপরে গড়ে উঠে চট্টগ্রামে মাস্টারদার "সাম্যাশ্রম", বগুড়ায় যতীন রায়ের "গণমঙ্গলাশ্রম", দৌলতপুরে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও কিরণ মুখার্জির "সত্যাশ্রম", ডায়মণ্ডহারবারের সাতকড়ি ব্যানার্জি ও রসিক দাসের "সত্যাশ্রম", হুগলির নগেন মুখার্জি ও ভূপতি মজুমদারের "বিদ্যাশ্রম", ঢাকার বাহেরকের জিতেন কুশারীর "সত্যাশ্রম", বরিশালের নলচিড়ার শচীন করগুপ্ত ও মনোহর মুখার্জির "বিবেকাশ্রম", গৈলার চিন্তাহরণ গুপ্ত ও সুধীর সেনের "গৈলা সেবাশ্রম" এবং আরও কিছু কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান যার নাম এখন মনে পড়ছে না।

যুগান্তর দল কংগ্রেসে পুরাপুরি যোগ দিলেও ঢাকার অনুশীলন তাতে যোগ দেয়নি। বি. পি. সি. সি. "দেশবন্ধুকে সভাপতি ও ভূপতি মজুমদারকে সম্পাদক করে পুনর্গঠিত হয় এবং তা যুগান্তর দলের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। চট্টগ্রামের অতুল সেন ও মাস্টারদা তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং অসহযোগ

আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৮ সনে মাস্টারদা কলিকাতা কংগ্রেসের ডেলিগেট হন এবং ১৯২৯ সনে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। তখন থেকেই জেলা কংগ্রেস অফিস বিপ্লবীদের গোপনকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯২৩ সনে মাস্টারদার নির্দেশে রেলওয়ে ১৮ হাজার টাকা লুট করা হয়। ধরা পড়ে মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিং বিচারে মুক্তি পান। ১৯২৬ সনে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে কলিকাতায় ধরা পড়েন মাস্টারদা। ১৯২৮ সালে মুক্তি পান। ১৯৩০ সনে ১৮ই এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করেন। সেদিন চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ২২শে এপ্রিল শহরের নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়। সরকারী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। রাত্রির অন্ধকারে মাস্টারদা ও তাঁর সহযোদ্ধারা সম্মুখসমরে নিহত ১২ জন তরুণ বিপ্লবী শহীদকে পাহাড়ের শীর্ষে রেখে, পাহাড় ত্যাগ করে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সনে ২রা ফেব্রুয়ারী গৈরলা গ্রামে অতর্কিতে গুর্খাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হন। ১৯৩৪ সনেই ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে তারকেশ্বর দস্তিদারসহ ফাঁসিতে আত্মাহুতি দেন।

১৯৩২ সনে ১৩ জুন ধলঘাট সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণ নিহত হয়, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদ হন।

১৯৩২ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতাকে দিয়ে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রথম মহিলা শহীদ হন।

মাস্টারদার চট্টগ্রামের বিপ্লব প্রচেষ্টার এবং অভ্যুত্থানের কাহিনী অনেক লেখা হয়েছে এবং হবে। আমি তার অতি সামান্যই উল্লেখ করেছি।

এখানে অনেক বন্ধু আমাকে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে অনুরোধ করেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে অনেক কথা স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আমি মাস্টারদার সাথে পরিচিত হই ১৯২৮ সনে। ৭১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী, ভূপেনদার নির্দেশ মত আমাকে নিয়ে যান শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা লণ্ড্রীতে। সেখানে আমি প্রথম মাস্টারদার সাথে পরিচিত হই। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে বি. পি. সি. সি. অফিসে সতীশদার ঘরে যান। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে সতীশদা তখন বি. পি. সি. সি.-তে যুগান্তর দলের চীফ হুইপের মত কাজ করতেন। আমি তখন

ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলাম। বাংলাদেশে তখন অনুশীলন ও যুগান্তরের মিলন পর্ব চলছিল। সেই সময় দলগত ভাবে আমাদের সতীশদার নির্দেশ মেনে চলতে হ'ত। তার পরেও ১৯২৯ সনে অন্যান্য জেলার বন্ধুদের সাথে দুটি গুপ্তসভায় মাস্টারদা ও অম্বিকাদার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে হয়। ১৯২৭/২৮ সনে জেল থেকে বেরিয়ে যুগান্তর ও অনুশীলনের মিলনকে রূপায়িত করতে নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট হন। যেহেতু অনুশীলন দল আগে কংগ্রেসে যোগ দেয়নি, এই সময় তাঁদের যতটা সম্ভব বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস সংগঠনে নিয়ে আসা হয়। কলিকাতা কংগ্রেসে যে ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হয়, তাকে ভবিষ্যতে বিপ্লবী সেনাবাহিনী তৈরির প্রথম ধাপ হিসাবে রূপ দিতে নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট হন। যদিও অভ্যর্থনা সমিতির অঙ্গ হিসাবে এর স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু ভিতর থেকে বিপ্লবীরা এটিকে "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" নাম দিয়ে (ভবিষ্যতে মিলিটারী অর্গানিজেশান করার দিকে নজর রেখে) সুভাষচন্দ্র বসুকে জি. ও. সি. করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে গঠন করতে সচেষ্ট হন।

জি. ও. সি.-র এডিকং হন ভূপেনদা। কর্নেল এবং অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারী দুই দল থেকেই নেওয়া হয়। ছয়জন মেজরের মধ্যে দুইজন আসেন অনুশীলন থেকে—প্রতুল ভট্টাচার্য এবং জগদীশ চ্যাটার্জি। চারজন আসেন যুগান্তর থেকে—মাস্টারদার মনোনীত গণেশ ঘোষ, হেমদার মনোনীত সত্য গুপ্ত, পূর্ণদার মনোনীত পঞ্চানন চক্রবর্তী ও মধুদার মনোনীত বিনোদ চক্রবর্তী। ১৯২৮ সনে কংগ্রেসে আমিও ডেলিগেট হয়ে আসি এবং বিশেষ কোন দায়িত্ব না নেওয়ায় এডিকং-এর অফিসে বসতাম এবং সকলের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা হ'ত। মাস্টারদা এবং অম্বিকাদার সঙ্গে তো পূর্বেই আলাপ ছিল। এই সময় গণেশ ঘোষ, পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও শশাঙ্ক চৌধুরীর সাথে খুবই হৃদ্যতা হয়। জেলে মাস্টারদার সহকর্মী সতীদা (সতীভূষণ সেন—যিনি পরে আমৃত্যু যুগান্তর সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন) এবং ধীরেনদার (চক্রবর্তী) খুবই স্নেহভাজন ছিলাম। যতীন রক্ষিত ছিলেন হিজলী ও দেউলীতে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেউলীতে আমি যে ঘরে ছিলাম তাঁর তের জন আবাসিকের মধ্যে এগারজনই ছিলেন চট্টগ্রামের ও মাস্টারদার সহকর্মী। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন জালালাবাদের যোদ্ধা। আমি হয়ে উঠেছিলাম ওদেরই পরিবারের একজন। ছোটদের মধ্যে আমার অতি স্নেহভাজন বিজয় (আইচ) ও উমেশ (সিংহ) আজ আর নেই। যতীন রক্ষিত এবং শশাঙ্ক

চৌধুরী অনেক আগেই চলে গেছেন। বিনোদ চৌধুরী এখন চট্টগ্রামে আছে, আর কে আছেন বা নেই জানিনা। শুনেছি বনবিহারীও (দত্ত) খুব অসুস্থ। আগেই বলেছি যে সবই প্রায় বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। অতএব বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও স্মৃতিচারণের চেষ্টাই বৃথা। এতক্ষণে আপনাদেরও হয়ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেছে এই বৃদ্ধের অসংলগ্ন উক্তিতে। আজ এখানেই শেষ করছি।

বলিহারি চট্টগ্রাম!

১৮৫৭ সালে মঙ্গলপাণ্ডের শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ বছরের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং দেশীয় বাহিনীর হাবিলদার রজ আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। মুক্তিপাগল সিপাহীরা অস্ত্রাগার দখল করে। কোষাগার অধিগ্রহণ করে সংগ্রহ করে তিন লক্ষ টাকা এবং কারাগার উন্মোচন করে মুক্তি দেয় সমস্ত বন্দীদের। এই সময় চট্টগ্রাম তার স্বাধীন স্বত্বা বজায় রেখেছিল চার মাস।

রজ আলি আশা করেছিলেন পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য তাঁদের এই যুদ্ধে মদত দেবে। কিন্তু হতাশ হতে হলো যখন ওঁরা দেখলেন ত্রিপুরারাজ ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছেন।

পর শত্রুকে পার পাওয়া যায়—কিন্তু ঘর শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় শক্ত। যাই হউক স্বদেশের মান ও প্রাণ বাঁচাতে মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্মবলি দেন রজন আলি ও তাঁর অনুগত সিপাহীরা।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৭ সালে। ১৮৫৭ সালে ঘটেছিল এই সিপাহী বিদ্রোহ। নবীন সেন এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী। সূর্য সেন তাঁর একই গ্রাম নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন মহাকবির সান্নিধ্য। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন—বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে একটি দেশাত্মবোধক অমর কাব্যগ্রন্থ "পলাশীর যুদ্ধ"। এটি আনন্দমঠের পূর্বের রচনা।

সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি এবং মহাকবি সান্নিধ্য সূর্যের শিশু-মনে দেশাত্মবোধের বীজ বপনে যে বিশেষ সাহায্য করেছিল সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়ের—আমাদের সূর্য সেন বই; থেকে)

স্মরণের বালুকা বেলায়

বিনোদবিহারী দত্ত

(তৃতীয় প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি চট্টগ্রাম)

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময় বনবাদাড় পাহাড় ডিঙিয়ে আমি কুমিরা পৌঁছাই। সেখানে আমার বিপ্লবী বন্ধু সুরেশ বণিক রয়েছেন। একদিন গভীর রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার; পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ চলা। ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি একটি গুহায়। এত দুর্গন্ধ কিসের? প্রথমে বুঝিনি, আসলে এটা ছিলো একটা বাঘের আস্তানা, আমার সাথে সুরেশ বণিক ছিলেন, তিনি বললেন, কি সর্বনাশ এখনই তো যেতে হবে বাঘের পেটে। আমি বললাম, ব্রিটিশ আমাদের কিছু করতে পারেনি, বাঘকে আসতে দাও। বাইরে গর্জন শুনেছি, কিছুক্ষণ বাঘের গুহায় কাটিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে কুমিরা পৌঁছেছি। সেখান থেকে সাধারণ কুলির বেশে নৌকা ঠেলে সমুদ্র পার হয়ে গেলাম সন্দ্বীপ—সন্দ্বীপ সে সময় নোয়াখালির সাথে যুক্ত ছিলো, সেখান থেকে নোয়াখালি শহরে পৌঁছলাম, শহরটা তখন কেবল ভাঙছে, তাই ইংরেজরা সেখানে তেমন যেতো না। বিপ্লবের নানা কর্মপন্থা বন্ধুদের বিশ্লেষণ করে কিছু দিন পর কুমিল্লায় পৌঁছেছি।

দুর্গাপুরে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ি ১৯৮১ সালে রাত দু'টো হবে, পুলিশ সারা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে, আমি বুঝতে পারি। সেদিন বীরেন চক্রবর্তীর বাড়িতেই ছিলাম। তারা সব আটঘাট বেঁধে এসেছে, আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম যে করে হোক পালিয়ে যেতেই হবে, তাই বাড়ির দোতলার চিলেকোঠার উপর থেকে লাফ দিয়ে গড় পার হয়ে ধান ক্ষেত দিয়ে ছুটে যাবো, হাতে রিভলবার ভর্তি করে নিয়েছি; সুযোগ বুঝে অন্ধকারে লাফ দিয়েছি সেখান থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য একটা মাদার গাছ ছিলো অন্ধকারে টের পাইনি; গাছের উপর পড়ে বেশ আহত হলাম। তবু গড়িয়ে নিচে পড়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা পুলিশের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবার পর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। জড়াজড়ি করে দু'জন জলে ডুবে গেলাম, বিভলভারটা দূরে সরে পুকুরে ডুবে গেলো টের পায়নি,

ডোবাটা গভীর ছিলো, কয়েকটি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ধরে ফেললো এবং আমার নাকে মুখে জল ঢুকিয়ে অর্ধমৃত করে উপরে তুললো, সারা গায়ে রক্ত ঝরছে। দারোগা উমেশ দে খুব খুশি। রিভলভারটা অবশ্য ওখানে খুঁজলেই পেতো।

কিন্তু আমিও আমার গোঁ ছাড়তে পারি না, পুলিশ যখন আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো আমি বললাম, আমি তোমাদের রাজ অতিথি বটে, সেভাবে আমাকে নিতে হবে, গাড়ি চাই।

তারা মহা বিপদে পড়লো, গ্রাম দেশে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে রায় বাহাদুরদের হাতিটি নিয়ে এলো; আমি বললাম, ব্রিটিশের দালালের হাতিতে আমি উঠবো না। অবশেষে একটা গরুর গাড়িতে খড় বিচালি দিয়ে আমাকে তোলা হলো; ইতিমধ্যে রক্তপাতের ফলে বেশ দুর্বলও হয়েছিলাম।

আমার ধরা পড়ার কথা রাতে রাতে সারা মীরসরাইতে ছড়িয়ে পড়লো, সকাল হতে হাজার হাজার লোক আমাকে দেখতে এলো, গরুর গাড়িতে যখন আমাকে নিয়ে আসা হচ্ছে সঙ্গে বীরেনের বোন বিন্দুবাসী ও তাঁর বৌদি রাজেশ্বরী আমার সাথে, রাস্তার দু'পাশে লোকেরা আমাকে আদাব জানিয়েছে। সে কথা কখনো ভুলবার নয়।

অতীত দিনের স্মৃতি

দীনেশ দাশগুপ্ত

চট্টগ্রাম সদরঘাট ক্লাবের ব্যায়াম প্রদর্শনীতে, চট্টগ্রাম যুব সম্মেলনে, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে কমাণ্ডেনট হিসাবে, জালালাবাদ পাহাড়ে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে পলাতক জীবনে চন্দননগরে অস্ত্রাগার ষড়যন্ত্র মামলায়, চট্টগ্রাম জেলে এবং আন্দামানে লোকাদা।

বিপ্লবী বিদ্রোহী লোকাদার বিপ্লবী জীবনের অধ্যায়গুলিকে একত্রে না দেখলে পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানা যাবে না।

১৯২৭-২৮ সালে রাজবন্দী জীবন থেকে মাস্টারদার দলের সকল রাজবন্দীরা মুক্তি পান।

'অনন্তদা লোকাদা শরীর চর্চার মাধ্যমে ছাত্র এবং যুব সমাজকে "উন্নত চিন্তা সুন্দর মনের জন্য সুস্থ সবল দেহের প্রয়োজন" এই আদর্শকে রূপায়িত করতে চট্টগ্রামে সদরঘাট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, সদরঘাট ক্লাবের ব্যায়াম প্রদর্শনীর ফলে গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামাগার খোলার হিড়িক পড়ে যায় সুস্থ সবল দেহের জন্য। এসব ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে বাছাই করে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে ছাত্র যুব কর্মী সংগৃহীত হতো।

বিপ্লবী দলে যোগাদানের পর বিপ্লবী কর্মে যোগ্যতার স্তর ভেদে আমি রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, তারকেশ্বর দস্তিদার, নির্মল সেন অম্বিকা চক্রবর্তী ও মাস্টারদার সংযোগ ও পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, অনন্তদা, গনেশদা লোকাদার সঙ্গে সে সুযোগ হয়নি।

জালালবাদ যুদ্ধের পর পলাতক জীবনে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ মাস্টারদা, নির্মলদা, রামকৃষ্ণদা, ফুটুদা ও আরো অনেক সাথীদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মেশা ও আলোচনার সুযোগ হয়েছে।

লোকাদা, গণেশদা অনন্তদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ও আলোচনার সুযোগ হয়েছে দীর্ঘ আন্দামান বন্দী জীবনে।

১৯৩০-৩৮ সালে গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ, বিপ্লবীদের সাম্রাজবাদী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে ১৯৩০ "চট্টগ্রাম বিদ্রোহ" বিপ্লবী আন্দোলনে যুবক যুবতীদের মধ্যে "কারা আগে প্রাণ কে করিবেক দান" তার জন্য বান ডেকে ছিলো।

সেদিন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার বন্দী শিবিরে ১০ হাজার তারুণ্য শক্তিকে বিনা বিচারে রাজবন্দী হিসাবে আটক রেখেছিলো বৃটিশ সরকার আরো হাজার হাজার তরুণদের বিভিন্ন জেলে আন্দামানে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে কারাজীবন যাপন করতে হয়েছিলো রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে।

পৃথিবীর কোন বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায়নি শাসক গোষ্ঠী তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের জেলে আবদ্ধ রেখে একদিকে অত্যাচারের কঠোর নিষ্পেষনে বিপ্লবীদের স্পর্ধাকে ভাঙ্গার চেষ্টার সঙ্গে ২ শাসক গোষ্ঠীর আদর্শগত শত্রু "মার্কসবাদের" পুস্তক চর্চার সুযোগ দিয়েছে।

একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনে ভারতে দেখা গেছে ১৯৩০-৩৮ সালে বৃটিশ সরকার বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক বিভিন্ন বন্দী শিবিরে আন্দামান জেলে মার্কসবাদী চিন্তা ধারার পুস্তক পড়ার সুযোগ দেন।

নূতন আদর্শে দীক্ষা নিতে গিয়ে আন্দামান ও বিভিন্ন জেলে মার্কসবাদ উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অতীতের সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বিপ্লবী সাধনার কার্য্যধারাকে সন্ত্রাস-বাদ আখ্যা দিয়ে; ধিকার দিয়ে Communist Consolidation-এ যোগদান করেন, বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দ্দেশে। যদিও বৃটিশ সরকার ভারতে কমিউনিস্ট চিন্তাধারাকে বেআইনি ঘোষণা করে রেখেছিলো তখনো।

কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম যোগদেন কালীপদ চক্রবর্তী (পণ্ডিতদা) আনন্দ গুপ্ত ফকির সেন, লালমোহন সেন। বাকী চট্টগ্রামের বন্ধুরা যারা মার্কসবাদী সাথীদের সহযাত্রী হননি তাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হলো প্রতিক্রিয়াশীল বলে। কারণ মার্কসবাদের তত্ত্ব হচ্ছে "the men who are not with me are enemy to me। তাছাড়া মার্কসবাদের তত্ত্বই হচ্ছে "History of Civilization is History of class Struggle। মার্কসবাদের তত্ত্ব হচ্ছে জন্মসূত্রে মানুষ শ্রেণীভুক্ত। তাই ১০০ বিঘা জমির মালিক যদি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন তাহলে তিনি declassed সর্বহারা আর ১০ কাঠা জমি আছে সে যদি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না দেয় সে হবে শ্রেণী শত্রু।

জেলের নিয়ম অনুযায়ী স্টীমারে যেকোন বন্দীকে আন্দামান জেলে আনা হতো তাদের ১৫ দিন অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা এবং মেলা মেশা করতে দিতনা। তবে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দলের নেতারা তাদের দলের আগত বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারতেন। ৩০এ ডিসেম্বর অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আমিও আন্দামান গেছি। আমার সঙ্গে আমার দলের অনন্তদা, গণেশদা, লোকাদা ভাসা ভাসা আমার খবরাখবর নিতেন স্বভাবতই আমার দাদারা আমার সঙ্গে খোলা খোলি মিশছেন না। বলে মনে ক্ষোভ ছিলো।

১৫ দিন পর খোলাখোলি ভাবে মেশার সুযোগ এলো তখন অনন্তদা, গণেশদা ও লোকাদাকে এই উদাসীনতার কথা জিজ্ঞাস করলাম তাতে লোকাদা ছাড়া অন্য দুই নেতা যা উত্তর দিলেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি ।

লোকাদা অবশ্য অন্য নেতাদের তুলনায় প্রাণ খোলা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একদিন আলোচনা উঠলে লোকাদা বলেন "যেসব বন্ধুরা আগে আগে আন্দামানে এসেছে অন্যদলের সাথী হিসাবে তাদের মুখে শুনেছে" আমি আলিপুর জেলে প্রেসে কাজের সময় রাজনৈতিক বন্দীদের পাঠচক্র হতো তাতে আমি মার্কসবাদ বিষয়ে চর্চা ও বিতর্কে অংশ নিতাম "তাই এখানে এসে চট্টগ্রামের ৪ বন্ধুর মত দাদাদের গালাগালি দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার সঙ্গে বেশী মাখামাখি না করার। পরে আমার গতিবিধি দেখে ওঁরা কি করবেন ঠিক হবে।"

সন্দেহযুক্ত দাদাদের আমি বলি আপনারা আমাদের শিখিয়েছেন "ভারতের দীনতম দরিদ্রতম গ্রামের মানুষগুলির বিকাশের জন্য অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা রোজগার স্বাস্থ্য গৃহ দানের প্রধান বাধা হচ্ছে পরাধীনতা হতে মুক্তি তারপর Government of the People, by the People and for the People লোকতন্ত্রের মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মার্কসবাদের মাধ্যমে সর্বহারা এক নায়কত্ব আমরা গ্রহণ করতে পারবো না মার্কসবাদের ভুল ক্রটি কোথায় তা জানা দরকার বিচারগোষ্ঠী দরকার নিজেদের প্রস্তুতির জন্য, এর পর থেকে আমাদের মধ্যে আগে থেকে যে আলোচনা চক্র চলতো তাতে মার্কসবাদকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে আনা হয়।

কমিউনিস্টদের মার্কসবাদের আলোচনা ডাঃ নারায়ণ রায় ক্লাস নিতেন তাতে মাঝে ২ গণেশদা যোগ দিতেন এবং ক্লাসও নিতেন।

অতীতের নিজেদের মধ্যে এসব তর্ক বিতর্কের কথা আজ বলছি তাই নয়, আমার চট্টগ্রামের আন্দামান বন্দীদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তারা জানেন আমার তর্কের কথা। তারা এখন স্বীকার করবেন কিনা জানিনা তাদের বেশীর ভাগই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন একমাত্র লোকাদা ছাড়া, '৩৩শের অনশনে ৩ বিপ্লবীর জীবনের বিনিময়ে বন্দীরা লেখা পড়া, খবরের কাগজ খেলা-ধূলা খাওয়া দাওয়ার অনেক সুযোগ পান।

সেই সুযোগে অকমিউনিস্ট চট্টগ্রামের বন্ধুরা, বি, ভির বার্জ হত্যা মামলা ও লেবং স্যুটিং ও ঢাকার বন্ধুরা, মাদারীপুরের পূর্ণদা, জীবনদা পঞ্চাননদার সাথীরা তারা C.P.F গঠন করে Scout training ব্যায়াম ও ফুটবল টিম তৈরী করে। অনন্তদা ব্যায়াম Scout, ফুটবল খেলা magic ইত্যাদিতে বেশী উৎসাহ দিতেন। লোকাদা উৎসাহী ছিলেন ফুটবল, ড্রামা, থিয়েটার হাস্য কৌতুক ইত্যাদিতে। রাজনৈতিক ভাবে Conslidations এর বন্ধুরা আমাদের শত্রু মনে করলে খেলা-ধূলা, থিয়েটার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একযোগে অংশ নিতেন। বারীন ঘোষ পরিমল ঘোষ সিরাজুল ইসলাম যারা হাস্যকৌতুক নৃত্য ইত্যাদিতে সবার মনোরঞ্জন করতেন প্রচলিত ধারণা ছিলো লোকাদা এদের পেছনে। এদের মধ্যে পরিমল ঘোষ এখনো জীবিত। এখন সেই হাস্যমুখ পরিমলকে চেনাও যাবে না বার্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত।

লোকাদা খেলাধূলা থিয়েটার ইত্যাদিতে উৎসাহী হলেও খুব বেশী আরাম প্রিয় এবং সৌখিন ছিলেন।

১৯৩৬ সালে লোকাদার টিমের Standar Blue পৃষ্টপোষক গণেশদা আমার টিম Standar Red পৃষ্ঠপোষক অনন্তদা, আন্দামান ফুটবল লীগের খেলা। বড়দের মধ্যে লোকাদার টিম দুর্ধর্ষ আর ছোটদের আমাদের টিম Standar Red কারো চাইতে কম নয়। এই দুই টিমে রেশারেশী কম নয়। লীগের খেলায় final দুই দল মুখোমুখী পর পর দুদিন খেলা অমিমাংসিত থাকায় তৃতীয় দিন সকালে খেলা দেওয়া হয় তীব্র প্রতিযোগীতার পর ১ গোলে লোকাদার টিমের জয় হলো! সব চাইতে দুঃখের ঘটনা লোকাদার টিমের দুর্ধর্ষ Rightout ফনী নন্দী (কালারপুল যুদ্ধের সাজাপ্রাপ্ত) ঘরে এসে রক্তবমী শুরু করে। তিন দিন পর পর এই খেলাতে অত্যধিক পরিশ্রমে ফনী নন্দীর সুপ্ত ক্ষয়রোগ প্রকাশ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য আলিপুর জেলে ৩৭ সালে রোগের কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

'৩৭-এর ডিসেম্বরে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের সময় আমি অনন্তদা গণেশদা এবং লোকাদাদের জিজ্ঞাসা করি মুক্তি পাবার পর বন্ধুবান্ধবরা জিজ্ঞাসা করবে আপনাদের রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কি? তখন তাঁরা বলেন, "বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।"

১৯৩৮-এর জানুয়ারীতে অবশিষ্ট সমস্ত আন্দামান বন্দীদের ফেরৎ নিয়ে এসে কলিকাতার আলিপুর জেলে রাখা হয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় বৃটিশ ও জার্মানির মধ্যে। তখনও জার্মান ও রাশিয়া মিত্রতায় আবদ্ধ এবং যুক্তভাবে পোলাণ্ড আক্রমণ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সেদিন ভারতের কমিউনিস্টরা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর এই দাবীতে মুখর ছিলেন।

যুদ্ধে অক্ষ শক্তির সরীকদার জাপানের হাতে সিঙ্গাপুর ও বর্মা যুদ্ধে পরাজিত হলে ঐ দেশগুলি ইংরেজের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

অন্যদিকে ইউরোপে জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করে, রাশিয়া মিত্র শক্তি বৃটিশের সহিত যোগ দেন। ফলে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" ঘোষণা করে যুদ্ধকে সমর্থন করে। ভারতে কমিউনিস্টরা জেল থেকে জনযুদ্ধ সমর্থন করাতে মুক্তি পেয়ে বৃটিশের যুদ্ধে সহযোগীতা করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী দল এটাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ মনে করে "এই যুদ্ধে নেহিদেংঙ্গে এক পাই নেহিদেংঙ্গে এক ভাই।" ওঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন ১৯৪২ "ভারত ছাড়ো আন্দোলনে।" যোগ দেন ভারতের আপামর জনসাধারণ।'

আন্দামান প্রত্যাগত চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা কলিকাতার জেল থেকে বৃটিশের এই যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" ঘোষণা করে আবেদন করেন এবং সমর্থন করে কাগজে বিবৃতি দেন।

যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে ভারত রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে আমি তখন হিজলী বন্দী শিবিরে আবদ্ধ। বর্মার পতনের সঙ্গে২ একই দিনে আমাদিগকে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আন্দামান ফেরৎ দীর্ঘ মেয়াদি ৪৬ জন বন্দীরাও সে সময় ঢাকা জেলে ছিলেন। আমি গোপনে অনন্তদার কাছে লিখে জানতে চাইলাম আপনারা জেল থেকে বের হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে মতামত ঠিক করবেন বলেছিলেন এখন কাগজে দেখছি আপনারা কমিউনিস্ট হিসাবে

বৃটিশের এই যুদ্ধকে "জনযুদ্ধ" বলে সমর্থন জানিয়ে মুক্তির আবেদন করেছেন। অনন্তদা গোপনে একলম্বা চিঠিতে জানালেন কৌশলের জন্য এবং সামনা সামনি আলাপ না হলে ভুল বোঝাবুঝি থেকে যাবে। লোকদা তাদের বিবৃতিতে সহযোগী নয় তা "আমাকে জানান নি। লোকাদা গোপনে চিঠিতে জানালেন তিনি জনযুদ্ধের" স্বাক্ষর কারীদের মধ্যে নাই এবং বন্ধুরা তার সঙ্গে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার করে না।

লোকাদার চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে আমার জীবনের ঘটনার বর্ণনা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে তাই অতি সংকোচে এই অভিব্যক্তিগুলি।

মুক্তির পরে লোকাদা কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি এম. এন রায়ের রেডিকেল দলের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

আমি সমাজবাদী দলে আছি তা জানা সত্বেও লোকাদা আমার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রেখেছিলেন যদিও রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হতো। মতান্তরে তাঁর সঙ্গে কখনো মনান্তর হয়নি। এই স্মৃতিই এখন আমাদের পাথেয়।

কথা প্রসঙ্গে

লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে প্রকাশিত ও প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় এবং সাধনপ্রসাদ দত্ত সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লব"—পুস্তকের (১৯৯৫) ১ম খণ্ড পড়া গেল।

সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটি-র নামে যে সংগঠন, প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে পাঠকদের মনে প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেবে ; এ কোন সূর্য সেন ?

যাকে ঘিরে ত্রিশের দশকে পরাধীন ও অবনত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন এক ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তিনি ? না, অন্য কোনো এক সূর্য সেন !

একই নামে অন্য সূর্য সেন তাঁর সময়েও ছিলেন। এবং চট্টগ্রামেই এখনও আছেন। ভবিষ্যতেও থাকতে পারেন।

তাই, বর্তমান পাঠক-পাঠিকা ; যাদের বিশেষ করে জন্ম হয়েছে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পরে, তারা স্বভাবতই প্রথম ধাক্কায় বুঝতে পারবেন না। আর নব-অঙ্কুরিত কিশোর-কিশোরী কিংবা যুবক-যুবতীর অবগতির জন্যই তো অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এ সব বই লেখা হয়। কেবলমাত্র বয়স্কদের মুখ চেয়ে নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া যে, বা, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে, ফাঁসিতে কিংবা কঠিন-কঠোর কারাবাসে, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন, তিনি বা তাঁরা হলেন সবদেশে, সর্বকালে, সেই সেই দেশের সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি।

সে জন্য "শহীদ" বা "আত্মোৎসর্গকারী"—কথা উহ্য রেখে শেষের দিকে তাঁর বা তাঁদের কাহিনী ব্যক্ত করলে সেটা কি সঠিক বলে বিবেচিত হয়, বা হবে ?

এটাই আমার প্রথম জিজ্ঞাসা।

পুস্তকের প্রচ্ছদ পটের পরিচয়েও দেখি মাস্টারদা সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার। যদিও উভয়েই ফাঁসি মঞ্চে নিজেদেরকে বলিদান ক'রে চরম আত্ম-

ত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরাধীন ভারতে দেশবাসীর নির্বাক-নীরব চোখের জলের নির্মম বেদনায় তিলে তিলে বিদ্ধ হয়ে চির বিদায় নিয়েছেন, অবহেলায়, অনাদরে অসম্মান মাথায় করে, সবার অজান্তে। সেতো পরাধীনতার যুগ।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী স্বাধীনতার পরেও, আজ পর্যন্ত, তাদেরকে "ভারত-গৌরব" বলে কোন বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধিত করেনি। বা যথাযোগ্য সম্মান দেন নি।

এর চাইতে লজ্জা স্বাধীন দেশের পক্ষে আর কী হতে পারে?

এবার আসছি ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর নামকরণ সম্পর্কে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল শুক্রবার গুড-ফ্রাইডের দিনে, সুদূর পরাধীন আয়ারল্যাণ্ডের সশস্ত্র বিপ্লবীগোষ্ঠী আয়ার ল্যাণ্ডকে ঘৃণ্য অত্যাচারী শোষক ও শাসক, সম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির নাগপাশ থেকে নিজেদের দেশকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে যে আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, সেই Irish Republic Army-র দুঃসাহসিক অভিযানকে একান্তভাবে স্মরণ ক'রে ও অনুসরণ ক'রে, পরবর্তীকালে বিপ্লবী নেতা শহীদ সূর্য সেন, চট্টগ্রামের বুকে তেমনি এক সার্থক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। তাই সেই নাম, সেখান থেকে প্রেরণা পেয়ে পরিকল্পনা মত কাজ করেছিলেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা। ঘটনার পরম্পরায় আমার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে আমি মনে করি। পাঠকগণ সেটা ভেবে দেখবেন।

আর, সেই থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক কার্য কলাপের সংগে আয়ারল্যাণ্ডের একটি অঘোষিত যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। যার জন্য উত্তর ভারতে গঠিত হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েসন (পরে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান আরমি) এর সুবিখ্যাত বিপ্লবী শহীদ যতীন দাস যখন পঞ্জাবের লাহোর ব্রোষ্টাল জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর তিলে ২ দগ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন, তখন—, সুদূর আয়ারলাণ্ড থেকে এক তার বার্তায় বলা হয়েছিল—

"Family Terence Maeswiry unites Patriotic Indians in grief & pride on death of Jatindranath Das. Freedom will come."

এত সব ঘটনার পর বন্দী সুভাষচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যের কারণে ভারতের ইংরেজ শাসকদের কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ইউরোপে বাস করছিলেন, তখন, তিনিও

সুযোগমত আয়ার ল্যাণ্ডের এই বিপ্লবী নেতা ইমন-ডি-ভ্যালেয়ার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সাক্ষাৎ করে ছিলেন। নিজের চিন্তা ভাবনাকে বলিষ্ঠ করতে।

তবে, এখানে এই প্রসঙ্গে বলার অবকাশ আছে যে, সেই ১৯১৬ সালের ১৮ এপ্রিলের মাত্র একটি আকস্মিক সশস্ত্র অভিযানে কখনও তাঁরা সেইদিন-ই ঘুমন্ত আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পাবার স্বপ্ন দেখেন নি।

Irish Brigade-এর নির্ভীক ও বেপরোয়া সভ্যরা শুধু তার দেশকে দুঃসাহসিক ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু ও দমন-পীড়নের ভয়কে তুচ্ছ ক'রে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠার শিক্ষা দেবার জন্য সেই দুরন্ত অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। হ্যাঁ, জেনে শুনে।

তাই তাদের slogan ছিল Do and Die. নির্ভীক—বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিং তার (চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায়) এই কথাই জোর দিয়ে বলেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক তথা শোষকের ক্ষমতার মিথ্যে অহমিকার প্রাসাদ যে কতো ঠুন্‌কো সেকথা বোঝাবার জন্যই মাষ্টারদাও তার দুঃসাহসিক সহযোগীগণ ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছিলেন।

যতটা জানি সেই Irish Revolt-এ যোগ দিয়েছিলেন মাত্র পঞ্চাশজন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সৈন্য। অভিযান শেষে বেঁচে ছিলেন মাত্র একজন ! তার নাম ইমন-ডি-ভ্যালেরা। সে এক শিহরিত স্মরণযোগ্য স্মরণ !!

সেদিন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেও, কারাগার, তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তিনি কারাগার ভেঙে পালিয়ে, পরবর্তী বৃহত্তর বৈপ্লবিক আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অভাবনীয় সাফল্যের চূড়োয়। বিপ্লবী নায়ক শহীদ সূর্য সেন সেই একই ভাবে সশস্ত্র ভারতবাসীও বিশেষ ক'রে চট্টগ্রামের বুক থেকে বৃটিশ শাসকদের মিথ্যা ক্ষমতার দম্ভকে চূর্ণ করতে পারার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। আর সফলও হয়েছিলেন যে একই ভাবে অপরাপর বিপ্লবীগোষ্ঠী যদি নিজ নিজ জেলায় একই দিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে পারেন তবে সারা ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত করা কোনো ব্যাপারই ছিল না।

কিন্তু হায় সে আর হলো কই ? তাঁর স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল ! অন্যেরা সে পথ মাড়ালেন না।

তবু বলি ধন্য আয়ারল্যাণ্ড! ধন্য চট্টগ্রাম! ধন্য, রাসবিহারী বসু! ধন্য বাঘাযতীন! ধন্য, দূর অতীত হারিয়ে যাওয়া সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পথিকৃৎ নমস্য অরবিন্দ ঘোষ। এবং আর সব অমর শহীদবৃন্দ—

যারা পরাধীন জাতির দুর্বলতা, জড়তা, আড়ষ্টতা ও ভয় দূর ক'রে দুঃসাহসের বাণী ও দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সামনে অকুতোভয়ে তুলে ধরছিলেন।

বলেছিলেন,—"ভয় ভাংগো"।

বলেছিলেন, "এগিয়ে যাও"।

কাজেই এদের কথা যখন বলব, লিখব; ভাববো, তখন আমাদের এই বলে সতর্ক হতে হবে যে আমাদের সামান্য ভুল, ত্রুটি অথবা শব্দ চয়নে কোনো ক্ষেত্রেই শহীদদের প্রতি যেন বিন্দু মাত্র অবজ্ঞা প্রকাশিত না হয়। এই সব বিপ্লবীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পথের দাবী" বইতে বহুপূর্বে লিখে গেছেন—

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও। তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ। তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না। সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ।

দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়। কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব।"

এবার উল্লেখ করার বিষয় হলো যে বিপ্লবী অনুশীলন দলের চট্টগ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত চারুবিকাশ দত্তের "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নামে একটি পুস্তক সম্পর্কে।

অবশ্য তার আগে, সুকৌশলী ইংরেজ সরকার কর্তৃক চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানের ঘটনাকে বিকৃত ও ক্ষুদ্র ক'রে দেখাবার জন্য শুরু থেকেই নাম দিয়েছিল "Armoury Raid"!

সরকারী মামলাও সেভাবে করা হয়েছে।

তারপর পরিবেশিত হয় "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নামে এক সবাক ছায়াচিত্র।

এত সবের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের উন্নতমনা বৃহত্তর বৈপ্লবীক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সশস্ত্র ও দুঃসাহসিক এবং অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্যকে বিপথগামী হতে যে সাহায্য করেছে,

সে বিষয়ে অনুসন্ধানী, নিরপেক্ষ, দূরদর্শী ইতিহাস নিয়ে চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকগণ নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। কারণ, বিপ্লবী মহানায়ক শহীদ সূর্য সেন ও তার সঙ্গীয় তরুণ-তাজা বিপ্লবী গোষ্ঠী কেবল মাত্র অস্ত্রাগার দখলে ক্ষান্ত না হয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন লাইন ধ্বংস এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য রেলগাড়ীর লাইন উপড়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মসূচীর মধ্যে তা নিহিত আছে বলে সেই কথা-গুলি তুলে ধরলাম।

এ'ছাড়া, কথা ছিল, সহরের সব সাহেবদের কচুকাটা করা হবে, বন্দুকের দোকানগুলি দখল করা হবে, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করা হবে, ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করা হবে। তারপর সহর দখল ক'রে প্রয়োজন বোধে আমৃত্যু যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করা হবে। মৃত্যুর কর্মসূচী। ডেথ্ প্রোগ্রাম।

এক কথায় আয়ারল্যাণ্ডের সেই Do and Die! এবার এ সম্পর্কে আর একটি লেখার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। সেটা হলো—ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম বিপ্লব বইয়ে প্রকাশিত যুগান্তর গুপ্ত বিপ্লবীদের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের "প্রণতি" শিরোনামায় লেখাটির ছয় পৃষ্ঠার দিকে।

সেখানে তিনি লিখেছেন: '৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত্রে যে ঘোষণাপত্র প্রচার হয় তা পর্যন্ত সিন ফিনদের ম্যানিফেষ্টোর অনুবাদ।"

সুতরাং Irish Republic Army-র সঙ্গে মাষ্টারদার Indian Republic Army-র চিন্তাধারার আত্মিক যোগ সম্পর্কে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

কিন্তু ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলে প্রায় মধ্যরাত্রিতে উল্লেখিত কার্য্যসূচীর কিছু কিছু অংশ কার্য্যকরী করার পর অপ্রয়োজনীয় বহু রাইফেলকে পেট্রলের আগুনে দগ্ধ করার সময় অতর্কিতে, বাহিনীর এক সৈন্য হিমাংশু সেন, নিজেই ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁকে বাঁচাবার তাগিদে দুই সৈনাধ্যক্ষ অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ, সঙ্গী জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে হিমাংশু সেনকে বাঁচাতে মোটর গাড়ীতে তুলে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। যাবার আগে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রচলিত নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের সঙ্গে কোনো পরামর্শ কিংবা তাঁর আদেশ নিয়ে যান নি।

সুতরাং তাঁরা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী এবং চরম শাস্তি ছিল তাঁদের প্রাপ্য। অপর দিকে, সেই আকস্মিকভাবে ঘটনা ঘটে যাবার পর, দীর্ঘ সময়, সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন এবং আর সবাই, অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের প্রত্যাবর্তনের আশায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করলেন। এটা যে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে করতে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

কারণ ইংরেজরা তখন কোথায় কি করছে তা জানা ছিল না এবং যে কোন সময় দলভারী করে তাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারার সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই সর্বাধিনায়ক সেদিনের যুদ্ধক্ষেত্রে অতটা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন বলে বলা যায় নাকি ?

তারপর ক্ষুণ্ণমনে শহর ছেড়ে দূরে পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন।

মনে রাখতে হবে যে তখন মাস্টারদার সাথে ছিলেন যুদ্ধজয়ী চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আরমির তরুণ তাজা দুঃসাহসিক সশস্ত্র যুবক! এটা পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য ঘটনা।

তথাপি ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত যুববিদ্রোহ-কে-কি কেবল-মাত্র "অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" বলে মেনে নেবো ?

না, আমার তা' মনে হয় না।

এবার আরেকটি দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি যে, পরাধীন ভারতে উত্তর ভারতের সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল যখন গঠিত হয়েছিল—তখন তার নাম ছিল, হিন্দুস্থান রিপাবলিক এসোসিয়েশন। এর সঙ্গে মাস্টারদা সূর্য সেনের ঘনিষ্ট যোগ ছিল। সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। প্রমাণ সিদ্ধ।—

উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবী নেতা যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে যখন আগ্রা জেলে বন্দী ছিলেন তখন সেখান থেকে উদ্ধার করতে যে সব দুর্ধর্ষ বিপ্লবীগণ সেখানে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন—শহীদ ভগৎ সিং এবং স্বয়ং মাস্টারদা-ও।

এ কথার উল্লেখ পাওয়া যাবে প্রয়াত বিপ্লবী নেতা যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "In Scarch of Freedom" বইতে। সেখানে রিপাবলিক বা গণতন্ত্র কথাটার প্রচলন দেখা যায়। এমন কি একটি "শ্বেতপত্রে"—তার গঠনরূপেরও নমুনা দেখতে পাচ্ছি।

সূর্য সেন যখন মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র

তখন তিনি প্রয়াত সতীশ চক্রবর্তীর প্রভাবে যুগান্তর বিপ্লবীদলে যুক্ত হন। এবং অনিসন্ধিৎসু পাঠক হিসেবে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা চালিয়ে যান। শিক্ষা শেষে চট্টগ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়, যে একটি ঘরে তিনি থাকতেন ও গুপ্তবিপ্লবের কথা চিন্তা-ভাবনা করতেন সে ঘরটির নাম রেখেছিলেন "সাম্যাশ্রম"। পরে যখন চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটান তখন দলীয় নাম করেন "ভারতীয় গণতন্ত্রীদল"! সেই চিন্তাধারা বাস্তবে পরিণত হবার পূর্বেই তিনি ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন করেন। কিন্তু তাঁর লালিত গণতন্ত্রী সরকারের ভাবধারা অবশেষে এই ভারতেই কার্যকারী হয়। আর তার মধ্যেই আমরা মাষ্টারদাকে আবার ফিরে পাই।

আর এই ভাবেই মানুষের মৃত্যু হলেও মৃত্যুর পরও তারা স্মরণযোগ্য হন।

এবার আসি শ্বেতপত্রে।

"White papers"

"The object in the Association is to establish a Federated Republic of the States of India by an organised and armed revolution, that the final form of constitution of the republilc be formed and declared by representations of the people of the time when they will be in a position to enforce their decision that the basic principle of the Republic shall be universal sufferage and the aboliton of all systems which make exploitation of man by man possible."

'এই শ্বেতপত্রে-র উল্লেখ করলাম এই কারণে যে—অনেকের মনে আজও প্রশ্ন ওঠে—বিপ্লবীদের মনে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল কি, না। না, তারা শুধু স্বাধীনতা-ই চেয়েছিলেন। আমাদের উল্লিখিত শ্বেতপত্রে তার উত্তর পাওয়া যাবে। যা আপোষের মাধ্যমে শাসক ইংরেজের কাছ থেকে Transfer of Power-এর মাধ্যমে পাওয়া স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রে নানা পরীক্ষা নিরিক্ষার পর আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি।

সার্থক বিপ্লবী নায়ক শহীদ এবং ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চতুর্দশ শাখার প্রথম সম্মানিত সভাপতি সূর্য সেন ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ আমরা কুমিল্লাতে ২/১ দিন পরে যখন পাই,

তখন, আমি কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালার নবম কি দশম শ্রেণীর ছাত্র। সে ছিল অনাস্বাদিত—অথচ আকাঙ্ক্ষিত বিস্ময়-পুলকে ভরা এক আনন্দ শিহরণ! তাই নমস্য সংগ্রামীদের উদ্দেশে ছিল আমাদের নীরব বৈপ্লবিক অভিনন্দন।

তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। কিন্তু তখন তা হবার কোন উপায় ছিল না।

অনেক দিন পর অকস্মাৎ সে সুযোগ ঘটে গেল—১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভিযানের বর্ষিয়ান বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় বৈপ্লবীক জীবনে যিনি একাধিক বার মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেঁচে উঠেছিলেন, অভাবিত উপায়ে। দ্যাট ওয়াজ এ প্রেজেন্ট সারপ্রাইজ! সাক্ষাতের সময়টা ১৯৩৪/৩৫ সাল হবে।

তখন আমি রাজবন্দী হিসাবে রাজশাহী জেলার গোদাবাড়ী থানায় অন্তরীন আইন ভঙ্গের অপরাধে এক তুচ্ছতিতুচ্ছ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে রাজশাহী জেলের বিচারাধীন বন্দী· হিসেবে একটি ক্ষুদ্র cell-এ আটক ছিলেম। তার পাশের "সেলে" ছিলেন বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। তবু সেই চারদেয়ালের মধ্যেও প্রতিদিন আমাদের দেখা সাক্ষাত হতো।

সেই ক'টি সুখের দিনের কথা ভুলবো কেমন করে? উভয়ের মুক্তির পর, সুদীর্ঘকাল আমরা পরস্পর ছিলেম, পরস্পরের কাছের মানুষ।

তারপর পরিচয় হয় কারাক্লেশ মুক্ত বিপ্লবীনেতা গণেশ ঘোষের সঙ্গে। স্বাধীন দেশের শহীদ স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনে তাঁর অকৃপণ সাহায্য ছিল আমার অমূল্য সম্পদ।

৮০-র দশকে সাক্ষাত হলো ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর তৃতীয় সম্মানিত সভাপতি বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তের সঙ্গে। সে পরিচয় আজও অক্ষুণ্ণ। অম্লান।

তাছাড়া বিপ্লবী নায়ক শহীদ সূর্য সেনের দলের সঙ্গে আমাদের কুমিল্লার বিপ্লবী নেতা ললিত বর্মনের গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি যোগসূত্র ছিল বরাবর। ওকালতি করার সময় চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার দখল মামলায় কুমিল্লায় খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী কংগ্রেস নেতা কামিনীকুমার দত্ত; কারারুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী ললিত বর্মন গোষ্ঠীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। ঐছাড়া বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিং-এর ভগ্নী ইন্দুমতী সিং-এর মারফৎ চট্টগ্রাম দখল মামলার ব্যাপারে অর্থ সাহায্যও পাঠান হয়েছে।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর কর্মকুশলী স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ অনন্ত সিং যখন মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেনী স্টেশনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে-হতে বেঁচে গেলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ এককভাবে নিঃসঙ্গ ও নিসম্বল অবস্থায় উন্মাদ সেজে হাজির হয়েছিলেন কুমিল্লার কান্দির পাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত ব্যবহারজীবী কামিনীকুমার দত্তের বাসগৃহে গভীর গোপনে। সেদিন কংগ্রেস নেতা কামিনী দত্ত, যুগান্তর দলের বিপ্লবী নেতা বসন্ত মজুমদার ও কংগ্রেস নেতা মুখলেশ্বর রহমান প্রমুখ সাহসী দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা অনন্ত সিং-কে নিরাপদে কলকাতায় পোঁছে দেবার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর ১৯৩১ সালে বিপ্লবী নায়ক শহীদ সূর্য সেনের গভীর গোপন নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ও সহচর বিপ্লবী নেতা ফেরারী বিনোদ দত্ত সংগোপনে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন। গোপনে দেখা করেছিলেন বিপ্লবী নেতা ললিতবর্মন গোষ্ঠীর অপর নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী অখিল নন্দীর সঙ্গে।*

তখন বিপ্লবী অখিল নন্দী ও তার সহবাসী বিপ্লবীগণ অপর একটি action-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সবার অলক্ষ্যে।

তাই বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তকে বলা হলো যে তিনি যেন মাস্টারদাকে বুঝিয়ে বলেন, মাস্টারদার পরিকল্পনামত সে সময় কোন action কুমিল্লাতে হলে—কুমিল্লার বিপ্লবী গোষ্ঠী তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী action করতে ব্যর্থ হবে। তাই মাস্টারদার পরিকল্পনামত action কুমিল্লাতে যেন অন্য কোন সময় করার ব্যবস্থা করা হয়।

বিপ্লবীনেতা বিনোদ দত্ত সে কথা মাস্টারদাকে জানালে তিনি তাঁদের action-এর সময় পেছিয়ে নিয়ে যান ১৯৩২-এর ২৯ শে জুলাই।

কাজটি হলো কুমিল্লার এ, এস, পি—এলিসনকে খতম করা। সেটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন বিপ্লবী শৈলেশ রায়। কেউ জানতেই পারেনি—কে বা কারা সেই কাণ্ড ঘটিয়েছিল।

* এই বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিং পরবর্তীকালে, আমি যখন আলিপুর জেলে সেখানকার ফাঁসিমঞ্চে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার কাজে সেখানে প্রায় প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতুম, তখন তিনি সেখানে, সাধারণ ডাকাতি করার অভিযোগে আলিপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ছিলেন।

তার আগেই অবশ্য কুমিল্লার বিপ্লবী ললিত বর্মন গোষ্ঠীর বিপ্লবী নেতা অখিল নন্দী বিপ্লবী নেতা বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাদের সঙ্গী ১৯৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার আই, সি, এস জেলার শাসক মিঃ ষ্টিভেনস-কে তার বাংলোতে ঢুকে দিনের বেলায় হত্যা করেন। হাতে কলমে কাজটি করেছিলেন— কুমিল্লার বিপ্লবী ললিত বর্মন গোষ্ঠীর দুই নারী সভ্যা—শান্তি ও সুনীতি। এরা দুজনেই তখন পড়তেন কুমিল্লার ফয়জেন্নেসা স্কুলে! সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে।

তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সে এক অনন্য অসাধারণ, তুলনাহীন, অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এর আগে নারী-বিপ্লবীরা এমন দুঃসাহসিক ও বিপদজ্জনক কাজ করেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

(নেতাজী সুভাষ I.N.A.O. ঝান্সী বাহিনী গড়ার সময়, সিঙ্গাপুরে এদের কথা উল্লেখ করেছেন।)

অনুমান করি যে, কুমিল্লায় এই action-এ অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে পলায়িত জীবনে সার্থকনামা বিপ্লবী শহীদ নেতা সূর্য সেন, পরবর্তীকালে, তাঁর নিজস্ব বাহিনীর নারী বিপ্লবী প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। প্রীতিলতা, দলীয় নেতার ইচ্ছাপূরণে সমর্থ হয়ে নিজে বিষবড়ি সেবন করে সেই ১৯৩২ এর ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রির অন্ধকারে বৈপ্লবিক ইতিহাসে আর এক নূতন মাত্রা যোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমি তাঁদের সকলের অবিস্মরণীয় স্মৃতির প্রতি জানাই আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

* * *

এবার আমি ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর তৃতীয় বা শেষে সম্মানিত সভাপতি বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তের পলাতক জীবনের দুঃসাহসিক ও বিপদসংকুল কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিলে পুস্তকটি-তে দেখতে পাই, যে,

তিনি যখন নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ি পল্লীর আশপাশে অবস্থান করছিলেন, অর্থাৎ দলের সাহস ও কার্যকুশলতা বাড়াবার জন্য সেখানকার "তরুণ সংঘ" একটি বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে গিয়েছিলেন ব্যায়ামবীর বিপ্লবী গোবিন্দ সাহা। এই গোবিন্দ সাহা ছিলেন কুমিল্লার বিপ্লবী ললিত বর্মন গোষ্ঠীর সভ্য। পরে তিনি অনেক বছর ধরে রাজবন্দীরূপে ইংরেজের ফাটকে আটক ছিলেন।

সেদিন বিপ্লবী গোবিন্দ সাহা চলন্ত মোটর গাড়ী খালি হাতে আটকে রেখে সমবেত প্রায় হাজার দশেক হিন্দু-মুসলমান দর্শক গ্রামবাসীকে আনন্দে মুখরিত করে রাখেন।

আমাদের কুমিল্লার দলের সঙ্গে চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সম্পর্ক কতো গভীর ছিল সে কথা জানাতে এত কথা বলছি। বইটিতে আমার বিশেষ আকর্ষণের অন্যতম কারণ ছিল ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর (চট্টগ্রাম শাখা) তৃতীয় ও সর্বশেষ সম্মানিত সভাপতি ও বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তের দীর্ঘ ফেরারী জীবনের রোমাঞ্চিত ও অত্যন্ত বিপদজ্জনক অনেক অজানা ও অকথিত কার্য-কলাপের কথা ও কাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাওয়া। এ সব তথ্যসমৃদ্ধ বৃত্তান্ত লোকচক্ষে তুলে দিয়ে সম্পাদকদ্বয় ভারতের সমগ্র বিপ্লব অন্দোলনের, ইতিহাসের উপাদান সম্ভার, বহুলাংশে পুষ্ট করেছেন। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সবাই ধন্যবাদের পাত্র।

এবার আমি মহান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের গোপন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে— একটি চিঠির বিষয় উল্লেখ করছি। তখন তার বিপদজ্জনক ফেরারী জীবনের আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে।

চিঠিটির শুরুতে তিনি শিরোনামে দিয়েছিলেন "বিজয়া"। কারণ, সেদিন সত্যিই ছিল হিন্দুদের দেবী শ্রীশ্রীদুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি বিসর্জনের দিন। কিন্তু সেদিন তিনি যে "বিজয়া" স্মরণ করে চিঠি লিখেছিলেন তা' ছিল তাঁর অন্যতমা স্নেহধন্যা চিরবিশ্বস্তা বিপ্লবী নারী প্রীতিলতাকে নিয়ে। যাকে তিনি আহুতি দিয়েছিলেন দেশ মাতৃকার শ্রীচরণে। নীরবে। তাঁর সেই দুঃসাহসিক জীবনে, ঘরের নিভৃত নিরালায় ক্ষীণ প্রদীপ শিখার আলোছায়ার পাশে বসে জানতে চাইলেন দুর্গতি-নাশিনী, বরাভয়দায়িনী দেবীর কাছে: "মা আনন্দময়ী মা আমার, আজ তোমার বিসর্জনের দিনে তোমাকে একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি— আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি"?

বলা বাহুল্য যে একথা কিন্তু হিন্দুধর্মের দেবদেবীকে যিনি বা যাঁরা মনেপ্রাণে অতি উচ্চ আসনে না বসাতে পেরেছেন, তাদের দ্বারা বলা কখনই সম্ভব না। সুতরাং তিনি বিপ্লবী নায়ক হয়েও এখানে একজন খাঁটি হিন্দু; ধর্ম মানা ধার্মিক ব্যক্তি। এটা তাঁর চরিত্রের আর একটি অপরূপ রূপ। অবিস্মরণীয়া প্রীতিলতার পুরো নাম—প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। মাস্টারদা পরাধীন ভারতমাতার শৃংখল

মোচন চেষ্টার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে সাহেবদের নির্বিচারে হত্যা করতে ; সেদিন প্রীতিকে পাঠিয়েছিলেন মৃত্যু-গহ্বরে। প্রীতি, মাস্টারদার সেই সযত্নে পালিত উদ্দেশ্যকে সুসম্পন্ন করে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর সেই ইউরোপীয়ান ক্লাবঘরের আঙিনাতে মাস্টারদার হাতে তুলে দেওয়া বিষবড়ি সেবন করে আত্মবলিদানে মহতি হয়েছিলেন।

প্রীতিলতা ভারতের দুরন্ত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম নারী-শহীদের বিরল মর্য্যাদা পেয়েছেন।

এখানেই না থেমে, মাস্টার-দা, প্রীতিময়ী প্রীতিলতার উদ্দেশ্যে "বিজয়া"-তে আরো বলেছেন :

"তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তোর ভগবৎভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি, তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিংসংকোচে মিশেছি"।

মাস্টারদার এই স্পষ্ট উক্তির মধ্যে বিপ্লবী নারী, 'রানী', যাকে আমরা প্রীতিলতা বলে জানি, তিনি মহৎ থেকে মহীয়ান হয়ে উঠেছেন কিনা, তা পাঠকগণ বলতে পারবেন। যদি তাই বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে সে হবে প্রীতিলতার আর এক নব উত্তরণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হলো যে মাস্টারদা নিজে প্রীতিলতাকে সেদিন একটি শ্রীকৃষ্ণের ছবি দিয়েছিলেন।

আর এই ভগবৎ প্রীতি, ভক্তি বা শ্রদ্ধা কিন্তু তখনকার বিপ্লবীদের মধ্যে নতুন কিছু ছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, এর শুরু হয়েছিল, বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষের "ভবানীমন্দির" প্রতিষ্ঠা করা থেকে। কিংবা তার আগে। সেই ঘটনা পরম্পরায় (১৯০৫) আমাদের চোখে ভেসে উঠছে পুনার বিপ্লবী চাপেকার ভাইদের ছবি। ভেসে উঠছে আগেরই ফাঁসিমঞ্চে জীবনদানী নির্ভীক বিপ্লবী বন্ধুদের তলিয়ে যাওয়া ইতিহাস। যারা "ভগবত-গীতা" হাতে নিয়ে জীবন দিয়ে জীবন পেয়েছিলেন। (১৮৯৭)।

ভেসে উঠছে উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থান রিপাবলিক এসোসিয়েশনের ইসলাম-ধর্মী, অভিজাত বংশীয়, সৌম্যদর্শন, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসফাকউল্লার কথা। যিনি তার ধর্মীয় পবিত্র "কোরাণশরিফ" গ্রন্থ হাতে নিয়ে, নির্ভয়ে, এগিয়ে গিয়েছিলেন বধ্যমঞ্চের দিকে (১৯২৭)।

তাই বলছিলেম যে, অভয়দায়িনী শ্রীশ্রীদেবী দুর্গার কাছে মাস্টারদার এই যে

'নিঃসংকোচ আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ; তা' নমস্য বিপ্লবীদের কাছে নূতন কিছু নয়। তফাৎ এই যে, সে কথা সব সময় সবাই মুখ ফুটে বলে যাবার সময় পাননি কিংবা আদৌ বলেননি।

অপরদিকে স্মরণ করা যাক তাঁদের কথা যারা ভারত মাতাকে বন্দনা করে ভক্তিভরে "বন্দে মাতরম" ধ্বনি দিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন—ফাঁসীতে কিংবা স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্রে। এটা নিরস্ত্র কিংবা সশস্ত্র এই উভয় গোষ্ঠী সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। মাস্টারদার কথা, তার চারিত্রিক ঐ সব বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা না হলে তার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে একথা কি বলা যায়?

এ ছাড়া, অতীতের বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জী (বাঘাযতীন) কিংবা বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর জীবন কাহিনীতেও এই ভগবৎ চিন্তা ও বিশ্বাস সকল সময় কাজ করতো বলে আমরা জানতে পারি (সেটা ১৯১৫ সালের কথা)।

তারপর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রবাদপুরুষ নেতাজী সুভাষও তার কিশোর বয়স থেকে ভারত-প্রেমী, বৈদান্তিক, বিরলব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মহাপুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক প্রভাবে ছিলেন প্রভাবান্বিত। বস্তুতঃ পক্ষে বিপ্লবীদের মধ্যে কে যে স্বামীজীর প্রভাবমুক্ত ছিলেন তা বলা মুস্কিল (১৯৪৩।৪৪)।

এর সঙ্গে পাঠকের আরেকটি গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অর্থাৎ মাস্টারদার অজ্ঞাতবাসকালে ক্ষীণ প্রদীপশিখার নীচে লেখা তার সেদিনকার অবিস্মরণীয় "বিজয়া" লেখাটির পূর্ণবয়ান কেউ যদি কাটছাট করে প্রকাশ করেন তবে তা হবে মাস্টারদার চরিত্রের আংশিক মূল্যায়ন মাত্র! সঠিক-ও নয়। সম্পূর্ণও নয়। ঐ ধরনের কাজ করার অধিকার কোনো লেখক, সম্পাদক, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিজ্ঞ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বা বিপ্লবী পেতে পারেন না। এই কৃর্পণতা মানবিক চিন্তাধারার মূল্যবৃদ্ধি করে না। বরং ইতিহাসের ছাত্র কিংবা সত্যসন্ধানী পাঠকদের কাছে তিনি বা তাঁরা বিভ্রান্তকারী, অসত্য কথন—দুষ্ট লেখক রূপে চিহ্নিত হবেন। হন্।

তদুপরি, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর লেখকদের পঙ্ক্তিতে তিনি বা তাঁরা চিরদিন হয়ে থাকবেন, অপাংতেয়, অশ্রদ্ধেয়, অচ্ছুত এবং নীতিভ্রষ্ট; সুবিধাবাদী।

অতএব কৃপার পাত্র।

তারকেশ্বরের বংশ পরিচয়, রমানন্দ এবং

চাঁটগাঁর দস্তিদার পরিবারের ইতিবৃত্ত ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে জানবার এবং লিখবার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। এরা কারা এবং কোথা থেকে এদের আগমন, সে কথার খোঁজ মিলবে ইতিহাসে লিখিত সম্রাট শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র সুজার ঔরঙ্গজেবের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাত্র মিত্র ও পরিবারসহ বাংলার বর্দ্ধমানের একটি গ্রামে রসুলপুরে আস্তানা গাড়া থেকে। কথিত আছে রাম সিং তেওয়ারী নামে এক সহচর সুজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং দোস্ত বলে তাকে ডাকত। পরে ইনি দলবলসহ চাঁটগা শহরের অনতিদূরে একটি জায়গায় আস্তানা গড়েন। বর্ত্তমানে ঐ জায়গায় একটি মসজিদ ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। পরে ইনি আরাকানে ওরা আশ্রয় নেয় এবং বিশ্বাসঘাতক-এর হাতে প্রাণ হারায়। নবাব খেতাবী দোস্ত কালে দোস্তীদার থেকে দস্তিদারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ঠাকুরদা পর্যন্ত পৈতা ব্যবহার দেখা যেত। বাবার আমল থেকে আস্তে আস্তে উহা আর দেখা যায় না। ক্রিয়া-কর্মে দাশশর্ম্মণ ব্যবহার হত। আমার ঠাকুরদারা ৪।৫ ভাই ছিল। আমার ঠাকুরদার নাম ছিল নিশি—পুত্র বিজয়, বিনয়, বিমল, আরেকজনের নাম ছিল চন্দ্র-পুত্র পুক্কা (সতীশ) ফুটু (তারকেশ্বর) গোপাল। যেমন পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বাবার নাম ছিল-চন্দ্রকুমার আবার অর্দ্ধেন্দু ও হেমেন্দু দস্তিদারের বাবার নাম ছিল অক্ষয় দস্তিদার—এইভাবে বংশের কলেবর বৃদ্ধি হতে লাগল ও স্থানও পরিবর্ত্তন হতে লাগল। কেহ কেহ বলে দস্তিদারের আদি স্থান সারোয়াতলী আবার অনেকে বলে ধলঘাট—পাশাপাশি দুই গ্রাম।

বিজয়কৃষ্ণ দস্তিদার ও তারকেশ্বর দস্তিদার খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। বয়সে অনেক বড় বিজয়কৃষ্ণ অনুশীলন সমিতির বাঘা বিজয় বলে খ্যাত ছিল। আই বি. Department কোনও একজনকে হত্যার ব্যাপারে বিজয়-সুরেনদাস ও চন্দ্রশেখরের নাম প্রকাশিত হয়; তখনকার দিনে বিখ্যাত Government pleader ছিলেন ৺সতীশ চন্দ্র সেন। বিজয় দস্তিদারের আপন বড়মামা। সাক্ষীর.

অভাবে case টিকল না। উপরন্তু বিজয় দস্তিদারের পোর্টে চাকরী হলো। প্রতি শনিবার গ্রামে ফিরত। সোমবার শহরে চলে যেত। শনিবার-রোববার দাদার কাছে আসতো। তারকেশ্বর (ফুটু) ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদার সঙ্গে আলাপ করত এবং একসঙ্গে খাওয়া দাওয়াও করত। মার কাছে শোনা দাদা-ভাই মিলে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করত। ঠাকুরদা নিশি দস্তিদার ছিল যাত্রাদলের নাম করা ভীম। বিভিন্ন জায়গা হতে ডাক আসত ভীম বা ঐ জাতীয় অভিনয়ের জন্য। সেই সূত্রে বিজয় শুধু অভিনেতা নয়, অভিনয় শিক্ষক হিসাবেও নাম করেছিলেন। ছোটকালে আমরাও দেখেছি বিজয় দস্তিদারের পরিচালিত মঞ্চে ফুটু দস্তিদারকে অভিনয় করতে। গ্রামের লোকেরা অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। নিজেদের আপনজন ছাড়া অর্দ্ধেন্দু দত্ত (কাকা), রামকৃষ্ণ (কাকা), শচীনদা (মানদা), ফনী দাশগুপ্ত অসিত এবং ভোলা। ও সকলেই একই গ্রাম সারোয়াতলীর এদিক ওদিক গলিতে থাকত। বিষ্ণু মহাজন তখনকার দিনে নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় তাকেও দেখা যেত। পরবর্ত্তীকালে আমিও তার সাথে হিজলী জেলে ছিলাম। ফুটুকাকা, বড় ভাই ছিল সৌম্য, ধীর, স্থির লোক। সকলের ছোট গোপাল কাকাও অভিনয় পাগল ছিল। দুঃখের বিষয় সকলকেই জেল বাস করতে হয়েছিল। আমার খুড়তুতো ভাই, জেঠতুতো ভাই একই পরিবারের প্রায় সকলকেই বিপ্লবী কাজের জন্য জেলের ভেতরে ঢুকতে হয়েছিল। গ্রামে পড়তাম গ্রামে। বাবার শহরে বড় চাকরী হওয়াতে মা, ভাই, বোন সকলের সঙ্গে শহরে চলে যেতে হল। বাড়ীর খুড়তুতো ভাই-জেঠতুতো ভাই সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শহরে মিউনিশিপাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। সেখানে তখন পড়তো ফকীর সেন, ত্রিপুরা সেন, সরোজ দাশগুপ্ত, প্রাণেশ বানার্জী প্রমুখেরা। পারিবারিক গুণে আমি হয়ে গেলাম 'মাস্তান'। যেখানে গণ্ডগোল সেখানেই আমি অগ্রণী। গ্রামের ছেলে শহরে আসা মাত্রই হয়ে গেলাম 'হিরো'। পড়াশুনা ডকে উঠল। চোখে পড়লাম লোকনাথ বলের খুড়তুতো ভাই নিকুঞ্জবিহারী বলের। লোকে তাকে দ্বিতীয় অনন্ত সিংহ বলত। নানাভাবে পরীক্ষা করে আমাকে বিপ্লবে দীক্ষা দিল। একদিন খেলার মাঠে অনন্ত সিংহের চোখে পড়লাম। বিখ্যাত সদরঘাট ক্লাবে তাঁর কাছে শিখলাম বক্সিং। এবং আমি আমার দীক্ষা গুরুকে সে কথা জানালাম। শুনে খুবই খুশি হলেন। সদরঘাট ক্লাবের অনতিদুরে কর্ণফুলি নদীর পারে আমার বাবার আফিস। বাবার চোখে না পড়ার জন্য আমি বিকালে সদরঘাট

ক্লাবে যেতাম। শহরে নিজেদের বাড়ী ছিল। সদরঘাট রাস্তার এদিক ওদিক অনেকগুলি গলি ছিল। তার মধ্যে নাম করা দুটি গলি ছিল প্রশস্ত পাশাপাশি। একটির নাম ছিল দক্ষিণ নালা পাড়া। অন্যটি উত্তর নালা পাড়া। আমরা দক্ষিণ নালাপাড়ায় থাকতাম। ঠাকুরদার তৈরী বাড়ীর পেছনে ছোট পুকুর, আম গাছ, নারকেল গাছ ইত্যাদি। যার জন্য সুবিধা ছিল পেছনে লুকিয়ে বেপথে উত্তর নালাপাড়ায় যাওয়া যেত। আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে থাকতো যুব বিদ্রোহের নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য—আমাদের বাড়ীর সামনে থাকত রেলওয়ে ডাকাতির রাজেন দাশ—পরের দু'খানা বাড়ীর পরে থাকতো নিকুঞ্জ বল এবং আরও অনেকে। (বাড়ী মানে 'বাসা' শহরে বলত) এহেন পাড়ায় আমি একা বড়কাকা ও ঠাকুরদার কাছে থাকতাম। আমি অসহনীয় ছিলাম বলে বাবা আমাকে বড়কাকা ও ঠাকুরদার কাছে রেখেছিল। আমি এখানে বাস করলেও বাবা অফিসে গেলে মার কাছে চলে যেতাম ভাল-মন্দ খাওয়া ও এদিক ওদিক ঘুরবার জন্য কর্নফুলি নদীর পারে। গুরুদেব একদিন বলল শ্মশানে রাত্র ২টার সময় যেতে পারবি। সেখানে একজন নামকরা বিপ্লবীর সাথে দেখা হবে। আমিও সেখানে থাকব। বললাম ও কিছুই না। উত্তর এল, শনিবার মনে থাকে যেন। ঠাকুরদার পাশে শুতাম। দেয়াল ঘড়ি ছিল। ঢং ঢং ১২টা বাজল। ঠাকুরদাকে বললাম—পায়খানায় যাব। হাফপেণ্ট পরা ছুটলাম। নিকষকালো অন্ধকার। চলেছি, চলেছি রাস্তা শেষ হচ্ছে না। (পথের দূরত্ব কালীঘাট থেকে ধরমতলা) শেয়াল ডাকছে—ঝিঝি পোকার ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ। শ্মশানে পৌঁছালাম। একটা শব পোড়া অবস্থায় আছে। কাউকেও দেখছিনা। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে। কি করব ভাবছি। এমন সময় শব্দ শুনলাম—ভয় পেলি ? নিকষকালো আম গাছ হতে নেমে এলেন। দেখি আমার দীক্ষাগুরু। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এইরূপ নানা পরীক্ষার পর মানদার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মানদা আমাকে দেখে হাঁসল এবং বলল এই ত চাই। গ্রাম ছেড়ে এলি। শহরেও তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। টুলু শোন্। তুই আমার সঙ্গে গ্রামে যাবি, আবার শহরে আসবি। পারবি ত। হেসে বললাম কিছুই না। মুস্কিল হল ঠাকুরদা ও বড় কাকাকে নিয়ে। বড় কাকার কোমর থেকে খোলা বেল্টের মার কতই খেয়েছি বলার নয়। মিউনিসি-প্যাল স্কুলে পড়ছি আর দল পাকাচ্ছি। ক্লাসের শেষের বেঞ্চে বসে নানারকম কথা বলছি। এইভাবে ক্লাস VIII উঠলাম। একদিন ডাক আসল হেড্‌মাস্টারের

ঘর থেকে। উপস্থিত হয়ে দেখি সব মাস্টারমশাইরা হেড্‌মাস্টারের ঘরে। হেডমাস্টার মশায় কাছে ডাকলেন। দেখলাম দু'খানা বেত টেবিলের উপর রাখা। মোচ পাকানো দারোয়ান দরজা বন্ধ করে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। মার খেয়ে পালাবার উপায় নেই। তাকালাম। সব মাস্টারমশাইরা আমার নামে নালিশ করে শাস্তি চাইছেন। একটা হাতে বেত খেলাম। ব্যথা অনুভব করলাম। বুদ্ধি মাথায় এল। দ্বিতীয় হাত পেতে দিলাম। হেডমাস্টার এবার প্রচণ্ড রেগে হাতে মেরে নিজেকে সামলাতে পারল না। আমি এই সুযোগে দারোয়ানের গোঁফ ধরে এক বজ্র টান দিলাম। সে পড়ে গেল। আমি দরজা খুলে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি করে দৌড়ালাম। স্কুলের সমস্ত ছাত্ররা বাইরে জমায়েত ছিল। সকলে বাহবা দিল। আমি তখন দৌড়াচ্ছি। হেড মাষ্টার মশায় বাবাকে ডেকে আনলেন। এবং বললেন আপনার ছেলে না হলে রাস্টিকেট করে দিতাম। দয়া করে ছেলেকে আপনার স্কুলে নিয়ে যান। আমার বাবা গ্রাজুয়েট স্কুলের সেক্রেটারী। ওটাও বিপ্লবীভাবাপন্ন ছেলেদের আড্ডাস্থল। গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকানের পাশে। ঐ স্কুলেই পড়াশুনা শুরু করলাম। বাইরের শিষের শব্দ শুনলেই আমি হাওয়া। মাষ্টার এসেই আমার খোঁজ করতেন। না পেলে বাবাকে নালিশ করতেন। এইভাবেই দিন চলছে, স্কুলের পেছনেই খেলার জায়গা। স্কুলে ছুটি হবার পর দৌড়াদৌড়ি ব্যায়াম চর্চ্চা ইত্যাদি। সদরঘাট ক্লাব কর্নফুলি নদীর নিকটবর্ত্তী। গ্রাজুয়েট স্কুলের পেছনে নানারকম কলাকৌশল শেখার জায়গা। এখানে অনন্তদা, গণেশদা, নরেশদা, বিধুদা প্রভৃতির গোপন আড্ডা। পাশে গণেশদার দোকানের ভেতর গ্রাহক না থাকলে শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি চলত। আমি কথার ফুলঝুরি থেকে সরে থাকতাম তাই আমাকে বেশী ভালবাসত অনন্তদা, আমার বাসার পাশে থাকা নরেশদা, বিধুদা ইত্যাদি। আমার দীক্ষাগুরু নিকুঞ্জদাও আমার পেছনে লেগেই আছে। সকালে গুরুর সঙ্গে দৌড়ান ইত্যাদি। বুঝতাম কিছু একটা হতে চলছে কিন্তু তা সত্বেও কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আমার গুরু আমাকে নানারকম উপদেশ দিয়ে আটকিয়ে রাখত। বলত ভাল ২ ছেলেদের সঙ্গে মিশে শরীরচর্চা করে একটা দল তৈরী কর। দেখব তোর কেরামতী। একদিন বললাম আমার দলে ১৫ / ১৬ জন সাহসী ছেলে আছে। এর মধ্যে ফুটবল প্লেয়ার থেকে আরম্ভ করে দুর্দান্ত সাহসী ছেলেও আছে। বললেন একদিন পরীক্ষা করব। একদিন বলল অনন্তদার কাছে নিয়ে যাব। দেখবি

গাড়ী চলন্ত অবস্থায় টেনে থামিয়ে রাখবে। লোকাদার বুকে হাতী উঠবে। মন দিয়ে শুনতাম। এই সব খেলা একদিন দেখলাম। লোকাদা, অনন্তদার ভক্ত হয়ে গেলাম। অনন্তদা একদিন খবর দিল ১৫।১৬ জন ছেলেকে এক জায়গায় যেতে হবে, তুমি থাকবে ক্যাপটেন হয়ে। আমি আমার বন্ধুদের তৈরী হতে বললাম। কিছু শিক্ষাও দিলাম। দিবা-রাত্র ঘুষি মারা। লাঠিচর্চা চলল। পড়াশুনা মাথায় উঠল। আমার খুড়তুতো বোন বড়কাকাকে সব বলে দিল। কোমরের বেল্টের আঘাত সহ্য করতে হল। আমার বোনরা পড়াশুনায় খুব ভাল। তাঁরা চায়না বড়দা একটা গুণ্ডা হোক। কে কার কথা শুনে। একদিন দুপুর বেলা দুই দলে মারামারি হল। একদিকে অনন্তদার চেলা ও তার সঙ্গীরা অন্যদিকে দেখি আমারই এক বন্ধু চারুদার (অনুশীলন) ছেলেরা। দুই বন্ধু দুই দিকে দাঁড়িয়ে। মারামারি শুরু হয়ে গেল। চীৎকার শুনলাম আমার পক্ষের প্রাণেশ রবিপদ এবং আর দুইজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এবং আমার পক্ষেও তাই। সরোজ দাঁড়িয়ে চীৎকার করে আমাকে জানাচ্ছে। সহ্য হলনা লাঠি ঘুরিয়ে ঐ দলের দলপতির কাছে পেঁাছে ভোজালি বের করে বুকে ধরলাম এবং বললাম থামাও না হলে তুমি শেষ। সে কাঁপতেই কাঁপতেই চীৎকার করে ওদের তরফের সকলকে থেমে যেতে বলল। অনন্তদা সব জানল এবং আমায় বাহবা দিল। এরপরে যেখানেই গোলমাল সেখানে আমরা কয়েকজন অগ্রণী হতাম।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালের দুই সপ্তাহ আগে থেকে প্রস্তুতি পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। নরেশদা, বিধুদা নিকুঞ্জদার সহিত মাখামাখি অবস্থায় থেকেও আমি বিন্দুবিসর্গ ও কিছু জানতে পারিনি। শুধু ওদের কাছ থেকে উপদেশই পেতাম। অর্দ্ধেন্দুগুহের পেছনের একটি বাড়ীতে ফনীন্দ্রনন্দী ও অমরেন্দ্রনন্দী দুই ভাই থাকত। আমি একটি ছোট গলির ভেতর দিয়ে ওদের কাছে যেতাম। যাওয়ার সময় অর্দ্ধেন্দু ও ওর বাবাকে ছবির কাজ করতে দেখতাম। কথা-বার্ত্তা বলতামনা। ওরা ছবির ব্যবসাদার জানতাম। আমি পেছনে দুই ভাইয়ের কাছে গেলেই বলতো ; ওদিকে যাসনা। আমি বলতাম তাড়াতাড়ির জন্যই আসি। ওরা ব্যায়ামবীর। আমি ও শিখবার জন্য ওদের কাছে যেতাম। আমার কথা শুনে ওরা হাসতো একদিন আমার গুরু নিকুঞ্জদা বলল নন্দী ভাইয়েরা যা বলবে শুনবি। আমরা সব এক। আমার কাছে হেঁয়ালী মনে হল।

ওরা সকলে বলত আমি দুর্দান্ত বলেই আমার বাবা আমাকে নিজের কাছে না রেখে ঠাকুরদার কাছে রেখেছে। মধ্যেই মধ্যেই বলাবলি করত দুই ভাইয়ে, আমার বয়সটা নাকি কম। আমাকে খুব খাওয়াত। কিছুই বুঝতাম না। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে ঘটনা ঘটে গেল। গুরুদেব নিকুঞ্জদা ১৯শে এপ্রিল ভোরে আমাকে কর্ণফুলির ধারে নিয়ে গেল। দেখলাম সাহেব মেমরা মোটরে করে জেঠিতে আশ্রয় নিচ্ছে। নিকুঞ্জদা আমাকে বল্লেন দেখ্ গতকাল রাত্রে কি একটা হয়েছে। সাহেব-মেমরা জাহাজে আশ্রয় নিচ্ছে। মাথায় তবুও কিছু ঢুকছে না। দাদা বললেন ভোরে তোকে এখানে নিয়ে আসছি এটাও দীক্ষার একটা দিক। আমরা 2nd Front এর লোক। তোকে ও সুযোগ দেব। ভয় পাবিনা ত? আমি বললাম আমার পেট জ্বলছে। পেটে খাবার পড়লে আমি সব পারি। হাসতে হাসতে আমার হাতে বিস্কিট দিল অনেক। আমাকে রাস্তার এপারে নিয়ে এল। ঐপারে অর্দ্ধেন্দুর বাসা। তার পাশে একটা ভাঙ্গা স্কুল বাড়ী-দুইতলা। কিছুক্ষণ পরে ভাঙ্গা দোতলায় রিভলবার হাতে দাদাকে কি একটা ইঙ্গিত করছে দেখি অমরদা (নন্দী)। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরা রাইফেল নিয়ে ছুটে আসছে সঙ্গে পুলিশ বন্দুক হাতে। লোক জমে যাচ্ছে। হঠাৎ অমরদা পেছনের দিকে চলে গেল। কিসের ইঙ্গিত পেয়ে সাহেবরা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল। আমাকে নিয়ে দাদা পেছনে হটে গেল। পরে জানলাম অমরেন্দ্রদা এক কালর্ভাটের নীচে নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করছেন। চাঁটগাঁ শহরে তখন পাঞ্চজন্য খবরের কাগজে ১৮ই এপ্রিলের যুব বিদ্রোহের খবর বেরিয়ে গেল। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধের ঘটনা ২৩শে খবরের কাগজে পড়লাম নিকুঞ্জদার বাসায়। দাদা বললেন দেখলি কী ঘটনা ঘটে গেল। আমি অবাক হলাম। আমার পাশের বাসায় ভাড়াটে থাকত নরেশদা (রায়) বিধুদা (ভট্টাচার্য) জালালাবাদের শহীদ মুক্তি যোদ্ধা। আশ্চর্য কিছুই আগে জানতে পারলাম না। নিকুঞ্জদা আমাকে বোঝাল। আরে ভাবিসনা। ওরা ওদের কাজ করেছে, এর পরে আমাদের ও কাজ আছে। পেপার পড়া ছেড়ে দিলাম শুধু ছবিগুলো দেখতাম আর ভাবতাম। আমায় নিকুঞ্জদা বলল জালালাবাদ পাহাড় থেকে খাবার আনতে ফকীর সেন নীচে নেমে এসেছিল আর ফিরতে পারেনি। অমর নন্দী নীচে এসেছিল দ্বিতীয় ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানকার অবস্থা জানবার জন্য। দুঃখের বিষয় যোগাযোগ হওয়ার আগেই ডাঃ জগদাবিশ্বাসের বাড়ীর পাশে

কাঠের কালর্ভাটের নীচে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। ২২শে এপ্রিলের পর মাষ্টারদা ও সঙ্গিরা আত্মগোপনে গ্রামে আশ্রয় নিল। কয়েকদিন পর নিকুঞ্জদা মানদার শহরে গোপন আস্তানায় আমায় পাঠাল। মানদা আমায় বললেন এবার তোমায় কাজে নামতে হবে। খুবই কঠিন কাজ অর্থ দরকার। যে ভাবেই হোক টাকা চাই। তুমি কাজে নেমে পড়। আমি দুদিন আছি। আমার শহরে আসা যাওয়া থাকবে। তোমার দাদা বলে দেবে। Charity begins at home. আমি থাকি নালা পাড়ায় কাকার কাছে—হানা দিলাম বাবার বাংলোয়। বাবার ড্রয়ারে একশ টাকা পেলাম-মায়ের ট্রাঙ্কে কিছু গয়না। ছুটলাম ঐসব নিয়ে মানদার কাছে। বাহবা পেলাম। এবার একদিন হানা দিলাম আমার প্রিয়বন্ধু শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তীর কাছে। ওর বাবা বার্মা থাকত। এনে দিল টাকা মোহর ইত্যাদি। ওর কাকা মিউনিসিপাল স্কুলের মাষ্টার। যিনি আমাকে দেখতেন সাক্ষাত যম। আর তাঁরই ভাইপো দিলেন এত টাকা মাষ্টারদার নামে। ওর স্ত্রী এখন ও আছে বিধবা। ভবনের লাইফমেম্বার। শুনেছি মানদার কাছে অর্থ সংগ্রহকারীদের মধ্যে নাকি আমার নাম ছিল প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে। ঠাকুরদার অসুবিধার জন্য আমাকে ছোট একটা ঘরে একা থাকতে দিত। খুব আনন্দ হল। লম্বা পাশবালিশ মধ্যখানে রেখে ঢাকা দিয়ে রাত্রে বেরিয়ে যেতাম। বোন টের পেত। কাকাকে বলত না। কাকীমা খুব ভালবাসতেন আমাকে তাই রক্ষা। মধ্যে মধ্যে আমাকে মানদার সঙ্গে গ্রামে যেত হত। মানদার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া হত। মানদার বাবা প্রসন্ন সেন নাম করা কংগ্রেসি ছিলেন। আমার বাবার বন্ধু। মানদার সঙ্গে গ্রামে গেলে আমার নিজের বাড়ীতে যেতে পারতাম না। কারণ মানদার সহিত আমাকে বিভিন্ন সেলটারে যেতে হত। যুব বিদ্রোহের অনেকের সহিত আমার দেখা হত। দুটো রিভলবার আমাকে দিত আর দু'টো মানদা রাখত। গভীর জঙ্গলে রিভলবার মারার training দিত। প্রথমদিন নিয়ে গেল এমন একটা আশ্রয়ে সেখানে ছিল ১২জন মাটির দোতলা ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি সকলের হাতে ওয়েভলি রিভলবার, চকচক্ করছে। দিনটি ছিল মনসা পূজা। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। রাত ১টা হবে সকলে নীচে নামলাম। দেখলাম কাগজ পাতা আর খাওয়ার জন্ম কলাপাতা। একমাত্র বুড়ীমা ও ছেলে পরিবেশন করছে। আদেশ সকলে মুখ নীচু করে খাওয়া। শব্দ না করা। হঠাৎ বুড়ীমা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছে ওরে খোকা

ফরসা এই ছেলেটি নিরুর ছেলের মত দেখতে। তাই না? খোকা উত্তর দিল। না-মা। খাওয়া শেষ করে উপরে উঠে গেলাম। আদেশ হল এই আশ্রয় ছাড়তে।মানদা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। খোকা মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ওদের অন্য আশ্রয়ে নিয়ে গেল। মানদা আমাকে নিয়ে ধলঘাটের পথে রওনা হল। রাত্রে যাওয়ার পথে হঠাৎ একটা বাঁশঝাড়ের পিছনে আশ্রয় নিলাম। মানদা আমাকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে বলল কে আমাদের পেছনে পেছনে আসছে। শুধু বলল বিপদের আগে গুলি চালাবি না। আমি অতি ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম আলো ছোট করে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ধীরে ধীরে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। আমি ঘুরে পেছন থেকে ওর সামনে লাফিয়ে পড়ে বুকের উপর রিভলবার ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তায় শুয়ে পড়েছে, দেখলাম বৃদ্ধ এক চৌকিদার। মানদার কাছে ফিরে এলাম। সেই রাত্রে আশ্রয় নিলাম ধলঘাট সাবিত্রীদির বাড়ীতে। ভোরের দিকে মানদা অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং শহরে ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দিল। রিভলবার মানদার হাতে দিয়ে এলাম শহরে মায়ের কাছে বাংলোয়। এইভাবে দিন চলছে। ১৯৩১ শের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মানদা চট্টগ্রাম শহরে গোপন একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন নাম পাথরঘাটা। আমার ডাক পড়ল। অনেকক্ষণ কথা বলল—মোট কথা হল উনি আমাকে ডিনামাইটের ভেতরের মূল্যবান অংশগুলি (Parts) দিলেন এবং দফায় দফায় দেবেন এবং আমি যেন সযতনে রাখি বাবার বাংলোতে রাজী হলাম। মার প্রচুর চেষ্টাতে আমাকে বাংলোয় থাকার সুযোগ দিল। একদিন মা আমার আলাদা রুমের (খাবার জায়গা) মধ্যে এসে বলল তোর ড্রয়ারে লম্বা লম্বা ঐগুলো কি জিনিষ? বললাম ওগুলো বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি। মা সাদাসিধা মহিলা একদিন আমায় বলে আরে তোর বিছানার তলে ছোট একটি বন্দুক দেখলাম বড় ভারী। তোর বাবারটা কাঠের বড় অথচ ঐ রকম ভারী নয়। মানদাকে ঐসব বললাম। মানদা খুব খুশী, বলত মায়ের কথামত চলিস তা'হলে আমাদের খুব সুবিধা হবে। দুষ্ট ছেলে মার পরমভক্ত হওয়াতে বাবা আমার চলা ফেরার বিন্দু বিসর্গও জানতনা। বাবা আমার ঘরে ঢুকতনা। যা জিজ্ঞাসা করার মার কাছেই জেনে নিত অনেকটা দোভাষীর মত। ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের শহরের সব ভার মানদার উপরে ন্যস্ত ছিল। কোন ছেলেকে কোন জায়গায় দেওয়া হবে সব মানদার উপর Selection of boys and to keep

materials etc would depend on Town leader Sachin Sen alias Manda এই মানদার মারফতই absconding যুব বিদ্রোহের প্রায় সকলের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল।

তিনটা জায়গায় ল্যাণ্ডমাইন বসার চেষ্টা হয়েছিল এবার দু' জায়গায় ভাল-ভাবে বসান হয়েছিল। একটা পাহাড়ে কোর্ট কাচারীর উপর এবং দ্বিতীয়টি লাভ লেনে—আসকর দিঘীর পারে বসাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। মানদা আমাকে-ভোলা সেনকে-সুশীল সেন-রবি সেন, মধু গুহ-প্রভাত দত্ত প্রভৃতিকে দুই রাত্রি পাহাড়ের কোর্টে বসাবার জন্য পাঠিয়েছিল। অর্দ্ধেন্দু গুহ দুই রাত্রি আমাদের পাহারা দিয়েছিল। তৃতীয় দিনে ধরা পড়েছিল এবং নিবারণ ঘোষ আমাদের নাম বাদ দিয়ে অন্যদের নাম ও অর্দ্ধেন্দুর নাম বলে দিয়েছিল। অর্দ্ধেন্দু জানত না আসকর দিঘীর পার ও লাভ লেনে কারা ছিল।

এবার একদিন মানদা আমাকে বললেন তোকে উপরের আদেশে জানাচ্ছি তোকে আমাদের শিক্ষিত দলের একজন ছেলেকে (গ্রামের) আশ্রয় দিতে হবে। মাথায় বাজ পড়ল। কি করব ভেবে পাচ্ছিনা। বাংলোতে আমার ভাই (৪জন) বোন (৪ জন) থাকে। চাকর চাকরাণী এবং দ্বারোয়ান। একই সময়ে দীনেশ দাশগুপ্ত ও কমনীয় দাশগুপ্তের গ্রাম থেকে শহরে থাকার জন্য আসছে। দীনেশ দাশগুপ্ত আপন জনের কাছে উঠেছে এবং আমার সাথে পরিচয় ও আছে। একদিন কমনীয় দাশগুপ্ত আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। আলাপ হল। B. Sc পাশ। শহরে থাকার স্থান নেই। শিরে সংক্রান্তি। আমার বাসার সকলেই ধপধপে সাদা চেহারা। ও নিকষ কালো। মানদার সহিত আলাপ করলাম। মানদা বলল শহরে একে আমাদের দরকার। যেকোন জায়গায় একে স্থান দাও। মার মারফত বাবাকে জানাই আমার ছোট ভাইয়ের জন্য একটি ভাল ছেলে পড়াবার জন্য রাখতে হবে। আমার সামনেই বাবা মার সঙ্গে কমনীয় দাশগুপ্তের কথা হল। রাসভারী লোক বাবা, একবার দেখল এবং নাম জিজ্ঞাসা করল। বাবার দুর্বলতার কথা আগেই শিখিয়ে দিয়েছি, সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল এবং নিজের নাম বলল। পাশ হয়ে গেল। আমার বাসায় স্থান পেল। মাষ্টার মাইনা চায় না শুধু থাকা-খাওয়া ইত্যাদি। অবশ্য বাবা-মা মাইনা ছাড়া রাখবেন না। মাইনাটা আমিই ঠিক করলাম। দু'জনেরই বাইরের খাওয়া ঠিক করে নিলাম। একদিন দুপুরবেলা কমনীয়দা আমায় বলল

নদীর পাড়ে যেতে। সঙ্গে গেলাম। দেখি নৌকা থেকে নেমে এল আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে হরিপদ। বাবা সকাল ৮ টায় অফিস যায় ১২ টায় ফেরে এসে খাওয়া দাওয়া করে এবং একটার সময় অফিস চলে যায় ফিরে ৫/৬ টায়। চালাক লোক কমনীয়দা। আমার বাসায় মা চাকর ছাড়া ঐ সময় কেউ থাকে না। সব কিছু টাইম বাঁধা তিনজনে দৈ-চিড়া-মুড়ি খেলাম! পরে তিনজনে নির্দেশমত আর একজন বামন দাসের বাসায় হরিপদকে রেখে আসলাম। ঠিক চারদিন পর কমনীয় দাশগুপ্ত-দীনেশ দাশগুপ্ত ও আমি ফুটবল ফাইনেল খেলা দেখতে গেলাম। আমরা দু'জনে কমনীয়দার নির্দেশে দু'খানা ছাতা নিয়ে খেলার মাঠে চলে গেলাম। দেখি দীনেশদাও ছাতা বগলে নিয়ে খেলার মাঠে। খেলা শেষ হল—হঠাৎ হরিপদ ছাতা বগলে উপস্থিত। দীনেশদার ছাতাটা হরিপদর ছাতাটার বিনিময় দেখলাম। হরিপদকে বলা হল আমরা এক সাথেই বাসায় ফিরব। কার্যত ঠিক উল্টোই হল। ধরা পড়ল ৩১শে আগস্ট ১৯৩১। ডি এস পি আসাহুল্লা হত্যার পর ছোট খাট হিন্দু-মুসলমান riot হওয়ার উপক্রম হল। কমনীয় দাশগুপ্ত আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। আর আমি সেইদিন ঠাকুরদাব কাছে নালাপাড়ায় ছিলাম। কাকীমা আমায় বলে দিল বড়দির কাছে চলে যেতে অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে চলে যেতে। যাওয়ার সময় যন্ত্রটা Revolber টা কাকীমার কাছে রেখে গেলাম এবং বললাম নিকুঞ্জদার কাছে দিয়ে দিতে। পরের দিন রাত দেড়টায় বাংলোয় ঢুকে মার কাছে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দরজায় শব্দ। বাবা বেরিয়ে আসলেন এবং পরে আমাকে নিয়ে এসে Police Inspector Kanchan Mia-র কাছে দিয়ে দিলেন। বাবার বিশেষ জানা। কিন্তু উপায় নেই বাবাকে বলার। আমাকে বলল যা বলার ঠিকমত উত্তর দিলে থানায় যেতে হবে না, ভ্যানে করে নিয়ে গেল এমন এক জায়গায় থানায় থেকে কিছু দূরে একটা ঘরে। আমাকে একটা হেলান চেয়ারে বসাল। বসিয়েই প্রথম প্রশ্ন রিভলবারটা কোথায়? বললাম জানি না। কি একটা ইঙ্গিত করল আমার দুই গালের উপর দুটি রিভলবার ধরে রইল দু'জনে পেছনে মাথায় একটা ঠেকিয়ে অন্য আর একজন। দেখলাম নিমেষে যন্ত্রপাতি সব সাজান হয়ে গেছে। সামনের টেবিলে সাজান অনেকগুলো চকচকে Nails এবং আমার হাত দুটো বেঁধে দিল একটা যন্ত্রের মধ্যে এবং ব্যাটারীর চার্জ আস্তে আস্তে বাড়াতে লাগল তখন কী যন্ত্রণা—বললাম বলছি। যেই কমিয়ে জিজ্ঞাসা

ওটা কোথায়—মাথা ঘুরছে অন্ধকার দেখছি বললাম জানি না। ঠিক এই সময় খবর এল থানা থেকে, পাঠিয়ে দাও। আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে দেখি সব সাদা চামড়া। পাশের ঘরে গোগানি শুনছি। জিজ্ঞাসা You want tea or milk. I replied milk. দুধ আর কেক এল খেলাম। পরে বলল Standup Shootar and Kelly asked me. Now tell us where is that Revolber. Being utter surprised replied I don't know. Both of six footers. They Kicked me on my stomack. I felt senseless. Next morning my father came to Thana and had a talk with Shooter & Kelly. I came out on bail. Now I understand my father's Boss was Port Engineer Mr Green. মনে পড়ছে বাবা আমাকে একদিন বলছিল তুই যদি ভাল করে পড়াশুনা করিস তা'হলে তোকে Marine Engineer পড়াবার সুযোগ আমার আছে। আজ মনে পড়ছে নেশার মত, সেদিন বাবার কোন কথা আমার মাথায় ঢোকেনি। হিন্দু বলে একতরফা কিছুক্ষণের জন্য মার খেতে হয়েছিল কর্ণফুলি নদীর পারে। নৌকা সাম্পান বেশির ভাগ চালাত মুসলমানরা কিন্তু বাবার বাংলোয় কেউ গোলমাল করে নি। বাবার বাসায় অনেকদিন ছিলাম। দারোয়ান দুখীরাম আমাকে চোখে চোখে রাখত। বন্ধু-বান্ধব কাউকেও ঢুকতে দিত না। ১৯৩১শের মে মাসে ফুটুকাকা ও কল্পনাদিকে দেখলাম আমার বাংলোর পাশ দিয়ে যেতে। অমানুষিক দৃশ্য। দেখেই গেলাম। বাবা অফিসে ছিলেন। ১৯৩২ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবা-মা সকলেই ৩।৪ দিনের জন্য নালাপাড়া ঠাকুরদার কাছে ছিল। এখান থেকে বাবা আফিসে যেতেন। রাত্রে এখানে থাকতেন। এখানে এসে আবার আমার পুরান স্বভাব জেগে উঠল। আমি গোপনে নিকুঞ্জদা ও অন্যান্য যারা বিপ্লবী আছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতাম। বাবা আমাকে বেইলে আনলেও তখনকার I. B. Dept. হয়তো আমার গতি-বিধি লক্ষ্য করত। বাবা এখানে থাকা অবস্থায় একদিন তারা এলো ভোর ৩ টায় বাবা দরজা খুলে দিলেন। আমিও ঠক ঠক করার সাথে সাথেই পিছনের দরজা খুলেই হামাগুড়ি দিয়ে পায়খানার পাশ দিয়ে উত্তর নালাপাড়ায় ভেতরে গিয়ে সটান বেরিয়ে একটা কালিবাড়ির পাশে এসে ভাবছি যদি বড় রাস্তার ঐ পারে যেতে পারি তা'হলে আমাকে পায় কে। কারণ ঐ গলি গাছ গাছাড়ায় ভর্তি। যেই আমি ঐ বড় রাস্তা পার হলাম। দেখি এক

পাঠান সৈনিক লুকানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে। বিরাট চেহারা। আমাকে ধরে ফেলল। নড়বার শক্তি নেই। বিড়াল যেন একটা বাঘের খপ্পরে পড়ল। অপেক্ষারত ভ্যানে তুলে আমায় বাসায় বাবার কাছে নিয়ে গেল, আমাদের ঘর তল্লাসী হল। কানাইলাল ক্ষুদিরামের বই ছাড়া কিছুই পেল না, বাবাকে বলে আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম জেলে ঢুকিয়ে দিল। ঐ জেলে তখন পূর্ণেন্দু দস্তিদার-দ্বিজেন দস্তিদার জালালাবাদ যুদ্ধের একজন বিজয় সেন, শান্তি নাগ, ননীগোপাল দেব, মহেন্দ্র চৌধুরী। এঁরা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমার অনুজ তারকেশ্বর

সতীশচন্দ্র দস্তিদার

১৯৩০ সাল। ৪ঠা মে রাত্রি প্রায় ১টা। আমার অনুজ তারকেশ্বর [ফুটু] অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ীতে উপস্থিত। সঙ্গে আছে তার কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধু—রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, সুবোধ চৌধুরী এবং ফণীন্দ্র নন্দী। তারকেশ্বর বলল, পরদিন তার সঙ্গী বন্ধুরা সহরে যাবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা সহরে যাবার জন্য তৈরী হল। আমি আমাদের সারোয়াতলী গ্রামের কালীকুমার চক্রবর্তীকে তাদের পথ-প্রদর্শক করে এগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কালীকুমার আসানুল্লা-হত্যাকারী হরিপদ ভট্টাচার্যের মামা। পরবর্তীকালে সে পেস্কার হয়েছিল। কালীকুমার ছয়জন বিপ্লবীকে আমাদের বাড়ীর পেছনের মাঠ দিয়ে শাকপুরা গ্রামের বোয়ালধালী খালের পাড়ে নিয়ে যায়। সে সেখান থেকে সাম্পানে করে তাদের সহরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। ঐ ছয়জন বিপ্লবীর মধ্যে রজত, দেবপ্রসাদ, স্বদেশ ও মনোরঞ্জন কালারপোল যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে শহীদের মৃত্যু বরণ করে। সুবোধ ও ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হয়।

তারকেশ্বরের জন্ম ১৯০৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রামে। পিতা চন্দ্রমোহন দস্তিদার ও মাতা প্রমীলা দস্তিদার। গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারকেশ্বর সহরে গভর্ণমেন্ট কলেজে ভর্তি হয়। বিদ্যালয়ে পড়বার সময় সে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কলেজে পড়ার সময় তার কর্মক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কয়েকদিন পূর্বে আমাদের গ্রামের রামকৃষ্ণ বিশ্বাস [তারিণী মুখার্জি হত্যার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত] পাথরঘাটায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এবং কিছুদিন পরে তারকেশ্বর চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসে বোমা তৈরীর সময় গুরুতরভাবে আহত হয়। তাই তাদের ঐ অভ্যুত্থানের প্রথম পর্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় নি।

তারকেশ্বর গ্রামে পড়বার সময় বিপ্লবী অর্দ্ধেন্দু দত্ত প্রমুখ তার কয়েকজন

সহকর্মীর সহযোগিতায় 'বীণাপাণি লাইব্রেরী' ও একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো ছিল বিপ্লবী দলে সদস্য-সংগ্রহের কেন্দ্র। কলেজে পড়ার সময়ও সে প্রায়ই গ্রামে এসে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম দেখাশোনা করত। তার সঙ্গে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও সদরঘাট ক্লাবের কোন কোন সদস্যও আসত। তারকেশ্বরের দেখাদেখি আমাকে প্রায় সকলেই 'বুগ্ গাদা' বলে সম্বোধন করত আমিও তাদের আপন ভাইয়ের মত আদর যত্ন করতাম।

একদিন ফেরারী অবস্থায় তারকেশ্বর ও বীরেন দে বরমা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছিল। ডি. আই. বি-র শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তাদের রাস্তায় দেখতে পেয়ে তারকেশ্বরকে ধরতে চেষ্টা করে। তারকেশ্বর শশাঙ্ককে গুলীবিদ্ধ করে বীরেনসহ অন্য গ্রামে চলে যায়।

তারকেশ্বরের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ দেখেছি। ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে ধলঘাট ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর শুনে তারকেশ্বরের চোখে জল দেখা দেয়।

১৯৩৩ সালের ১৮ই মে আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে এক খণ্ডযুদ্ধের পর তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও সুধীন দাশ গ্রেপ্তার হয়। এই যুদ্ধে অন্যতম বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার শত্রুপক্ষের গুলীতে নিহত হয়।

মাষ্টারদা সূর্য সেন কয়েকমাস আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর মোকদ্দমা চলছিল। তারকেশ্বর প্রমুখ গ্রেপ্তার হওয়ার পর আবার নতুনভাবে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। জেলের মধ্যে একটি ঘরে তাঁর বিচার চলছিল।

আমার এক আত্মীয় তারকেশ্বরকে 'স্নেহের ফুটু' সম্বোধন করে এক চিঠি দেয়। চিঠির নীচে সে আমার নাম লিখেছিল। তারকেশ্বরের নাম 'ফুটু'— তা প্রমাণ করার জন্য আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ চিঠিখানি আমার লেখা নয় বলাতে আমাকে তার একটি কপি লিখতে বলা হয়। ঐদিন মাষ্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনাকে কাঁটাতারে-ঘেরা একটি বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম।

চট্টগ্রাম কোর্টে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর আমরা হাইকোর্টে আপীলের সিদ্ধান্ত করি। আপীলের ব্যবস্থা করার জন্য আমি

চট্টগ্রাম থেকে উকিল বিনোদ সেনকে কলিকাতায় নিয়ে আসি। মাষ্টারদার পক্ষে বি. সি. চ্যাটার্জি, তারকেশ্বরের পক্ষে মেয়র সন্তোষ বসু ও কল্পনার পক্ষে জে. সি. গুপ্ত কৌসলী ছিলেন। কাজ কিছুই হল না, ফাঁসীর আদেশ বহাল রইল।

মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করি। প্রিভি কাউন্সিল করার বিষয় নিয়ে একদিন জেলে তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখি, একটি সেলে সে একা। তার পরনে কয়েদীর পোষাক, ডোরাকাটা প্যাণ্ট ও জামা। আমার সঙ্গে ডি. আই. বি-র শচীন ভৌমিক। তারকেশ্বর আমাকে পায়ে ধরে প্রণাম করতে চাইল, কিন্তু শচীন ভৌমিক বাধা দিল। তারকেশ্বর বলল, 'বুগ্‌দাদা, আর প্রিভি কাউন্সিল করে কী হবে। গভর্ণমেণ্ট এখন determined যে আমাদের ফাঁসী দেবেই। তাই প্রিভি কাউন্সিল করে লাভ নেই।' তারকেশ্বরের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

চট্টগ্রাম জেল থেকে লেখা তারকেশ্বরের অনেকগুলো চিঠির মধ্যে দুখানি চিঠির কিছু অংশ এখনো মনে আছে। মার কাছে লিখেছিল :

> 'মা, রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে দেখি। শারদীয়া পূজার সময় শিউলি ফুলের গন্ধ যেন জানালা দিয়ে আমার কাছে আসছে। বুগ্‌দাদাকে বলো কিছু বই ও কাপড় পাঠাবার জন্য।'

আমার স্ত্রীর কাছে লিখেছিল :

> 'বৌদি, তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি। মাকে বলো, আমার যে টাইফয়েড হয়েছিল, তখনো তো মারা যেতে পারতাম। কত লোক যে প্রতিদিন নানারকমভাবে মারা যাচ্ছে! আমার এ-মৃত্যু তা থেকে অনেক শ্রেয়ঃ। মনকে প্রবোধ দিও। বুগ্‌দাদাকে বলার আর কিছু নেই।'

আমি তারকেশ্বরের কাছে গীতা ও গীতাঞ্জলি পাঠিয়েছিলাম। ফাঁসীর পর সেগুলো ফেরৎ দেওয়া হয় নি। ফাঁসীর খবরটাও আমাদের জানানো হয় নি। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলাম, আমরা হিন্দু, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য হিন্দুমতে আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। ফাঁসীর কয়েক দিন পরে আমার চিঠির উত্তরে আমাকে মৃত্যুর তারিখটা জানায় – ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ ইং।

আমার পিতৃব্য নির্মল সেন

শ্রীহরি সেন

১৮৯৫ খৃঃ চট্টগ্রামের কোয়াপাড়া গ্রামে ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির অন্যতম যোদ্ধা শহীদ স্বর্গীয় নির্মল সেনের জন্ম। পিতা-স্বর্গীয় রসিক সেন মাতা হরসুন্দরী দেবী। রসিক সেনের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। নির্মল সেন সর্ব কনিষ্ঠ। ৫ বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গীবাজারে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন। স্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ও পরে মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় পূর্ণভাবে বিপ্লবীদলে আত্মনিয়োগ করেন। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম ছিল কিন্তু মধ্যে মধ্যে মা ও বড়বৌদি শ্রীমতি নলিনীবালা সেনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বৌদির পূর্ণ সমর্থন পেতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিপ্লবীদের বাড়ীতে আত্মগোপন করার জন্য স্থান দিতেন। বড়বৌদি ওদের দেখাশুনার সব ব্যবস্থা করতেন। প্রায় ৬ মাস রেঙ্গুনে থাকেন বিপ্লবীদের কাজ নিয়ে। পরে পুরীতে অন্তরীণ হয়ে এক বৎসর থাকেন। স্বভাবে গম্ভীর ও স্বল্পবাক হলেও সহকর্মী ও বয়সে ছোট বিপ্লবীদের কাছে তিনি স্নেহশীল দাদার মত ছিলেন। মাষ্টারদার সংগঠনে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

নির্মল সেন ধলঘাট যুদ্ধে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে মাষ্টারদা, প্রীতিলতা ও অপূর্ব সেনকে গোপন পথে চলে যেতে বাধ্য করেন। একা লড়াই করে কেপটেন কেমারুনকে নিহত করেন ও নিজে আহত হয়েও লড়াই চালিয়ে যান আমরণ। নির্মল সেনের মৃত্যুর পর উনার বড়ভাই যামিনীরঞ্জন সেনের এ. বি. রেলওয়েতে চাকরী চলে যায় এবং পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয় বাড়ীর সকলে। আমরা উনার মৃতদেহ পাইনি—তবে শুনেছি যে পাহাড়তলীর কোন অজ্ঞাতস্থানে গোপন জায়গাতে নির্মল সেন, অপূর্ব সেনের দেহ সমাহিত করা হয়।

আমার পিতৃব্য স্বর্গীয় নির্ম্মল সেন সম্বন্ধে সব কথা আমার জেঠাইমা শ্রীমতী নলিনীবালা সেনের কাছ থেকে শুনা।

নির্মল সেন পলাতক অবস্থায় একদিন বাড়িতে গিয়ে তাহার যত রকম ছবি

ছিল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছিলেন। পরিবারের লোকেরা বললেন, তুমি ছবিগুলো ছিঁড়ছো কেন! সে উত্তরে নির্মল সেন বললেন আমি মরবই। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে তোমাদের সকলকে বাঁচাতে চাই, তা ছাড়া আমি মরলে তোমরা আমার ছবি বুকে নিয়ে কান্নাকাটি করবে তাহা আমার ইচ্ছা নহে, আমার কোন স্মৃতি চিহ্ন বাড়িতে রাখিতে চাইনা।

কাছের মানুষ নির্মল সেন

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

[১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের কয়েকজন বিপ্লবী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। সফল আক্রমণের পর জঙ্গীদের বিদায় দিয়ে প্রীতিলতা স্বেচ্ছায় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন। তাঁর মৃতদেহে জামার ভিতর স্বহস্তে ইংরেজীতে রচিত তাঁর বিদায়বাণী ও বক্ষঃসংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের একটি ছোট ছবি পাওয়া যায়। ধলঘাট যুদ্ধের পর রচিত প্রীতিলতার একটি প্রবন্ধ সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের সময় সামরিকবাহিনীর হস্তগত হয়। প্রবন্ধের শিরোনাম সম্পাদক-প্রদত্ত।]

কণ্টক-মুকুট শিরে পরেছিলে বলে
আজ কত কোহিনুর তব পদতলে !

সেই গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণশীর্ণ কুটিরে বহু পুণ্যবলে নির্ম্মলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল. জীবনের সে শুভ মুহূর্ত্তটিকে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কেননা আজও সেই সবই তেমনিভাবে আছে। আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত রজনীই এসে গেল : কিন্তু নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজস্বী মানুষটি যাঁর উপস্থিতি সেই দিন সেই পর্ণকুটির আলো করে দিয়েছিল। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন দেখেছিলাম ! অন্ধকারে চোখ দুটো জলছিল ও মনে হচ্ছিল যেন বিদ্রোহীর মনের আগুন দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে। তাঁর মুখের কথার চাইতে আমার ঐ তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল। বিদ্রোহীর বাণী কেবল ঐ চোখ দুটোই যেন প্রচার করে দিচ্ছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জল বৃহৎ চক্ষু, কথাবার্ত্তা বলার পরে যখন উঠে দাঁড়ালেন মনে হ'ল যেন বংশীবাদক পলাশপদ্মলোচন কদমতলা

ছেড়ে সুদর্শনচক্র হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি বীর সন্তানকে মুক্তির জন্যে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করছেন।

নির্ম্মলদা আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমায় কে কি বলেছে। বললাম, সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদা (১) যে বলেছিল······Nirmalda is the last man to be captured. He is very intelligent—এই কথাটাই প্রথমে বললাম। তারপর রামকৃষ্ণদার আরও কয়েকটি কথা হুড়হুড় করে বলে গেলাম। কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে এই দুটো কথা বলেছিলাম, " 'No revolutionary can die with satisfaction. আমি যদি এখন বের হই, তবে I shall declare equal right to brothers and sisters." '

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, family-র প্রতি আমার কিরূপ টান আছে। বললাম, টান আছে, কিন্তু duty to family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে পারব।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা সব জানতে চাইলেন। বললাম, পাশ করব বলেই মনে হচ্ছে।

সেদিন যখন পাশের খবরটা পেলাম, মনে পড়ে গেল নির্ম্মলদা প্রথম দিনই আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার তো বিশ্বাস, যে যায় সে একেবারে চলে যায় না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের যা কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌঁছায়। তাই মনে মনে খবরটা নির্ম্মলদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদব্যথার সুর বেজে উঠে। মানবহৃদয়ের এই সব অতি সাধারণ সুখদুঃখের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে। কিন্তু আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আর ক্রন্দন। আমরা ভুলে যাই, যে শুভপ্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়া করে নিতে পারব সেই দিনই অমৃতের সন্ধান পাব।

তারপর আমি যখন বললাম যে, পাশ করতে পারব, তখন বললেন, "তোমার

(১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জি হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। —সম্পাদক।

কাছ থেকে extreme success demand করি, আগামী convocation-এ একটা attempt নিতে পারবে তো?"

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জ্জয় অভিমান এসে মনটা জুড়ে বসল এই ভেবে যে, এতদিন পরে মনের ইচ্ছাটা জানাবার সুযোগ মিলল। তাই নির্ম্মলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম, পারব না কেন? আপনারা তো আর বোনেদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "কেবল তোমাকে একথা বললাম—আমি অনেক দিন থেকেই জানি।" আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো বললেন, "পাশ করবার পর যে কোন district-এ একটা কাজ নেবার চেষ্টা করো—যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া ইত্যাদি। সেখানকার Magistrate, Commissioner সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে। কখন কোথায় meeting হয় সব খবর রাখবে এবং opportunity খুঁজে বেড়াবে।"

একটা Code বলে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আগে রমণের (১) through-তে যে Code পাঠিয়েছিলেন তা সে বলেছে কি না এবং কি বলেছে।

তারপর বললেন, "আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আর একটা কিছু করে যাই। এবার আমরা চাই যে একটা fight between intelligent and intelligent হোক।"

"যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব, কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধরা পড়ি নি, সেজন্য আমাদের thanks দেওয়া উচিত।"

দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয়, তখনও বলেছিলেন, "চাঁটগা শহরের উপর একদিন আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ একদিন শুনতে পাবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন revolutionist crushed হয়ে গেছে।"

যখন এসব কথা বলতেন, ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে

(১) বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্তের [যোশী] ছদ্মনাম। —সম্পাদক

সেই দেশে আবার কিসের দৈন্য ? কবি সত্যই গেয়েছেন :

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী
ওগো আমার ভারতরাণী !

তারপর বললেন, "আমাদের সাথে যদি আর কোন দিন দেখা না হয়, তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ।" আমি বললাম, সে কথা কি আর আমাদের বলে দিতে হবে ?

মেশিনটা বের করে বললেন, "আর কোন দিন দেখেছ কি ?" খুব ছোট্ট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম। মেশিনের কোন্ part-কে কি বলে, কি করে গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো এখন পর্য্যন্ত একটুখানি trainingও পেলাম না, কাজ করব কি করে ? বললেন, "বাড়ী থেকে আর কোথাও যাচ্ছ বলে চলে আসতে পারবে তো ?" পারব—বললাম। ও-রকম করে এসেই তো training নিতে হবে। সেদিন আর বেশী-কথা হয় নি। আমি যখন রমণকে ডেকে দিতে আসছি তখন বললেন, "তোমাকে তো ভাল করে দেখলাম না, আচ্ছা, আমি একবার ঐ ঘরে যাব তুমি আমায় চিনতে পারবে তো ?" বললাম—চিনব। অন্ধকারে যতখানি পারা যায় নির্ম্মলদাকে দেখে নিয়েছিলাম এবং যখন একথা জিজ্ঞাসা করলেন, মনে মনে বললাম, আর কিছু দেখে না চিনি চোখ দুটো দেখে তো চিনবই।

এই ভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হ'ল। কি অনুভূতি নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ? এ-সব জনের সঙ্গে দেখা হ'ল, এবার মাষ্টারদার দেখাও পাব—এ আশা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে যাওয়ার ঠিক হল। এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাষ্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চাঁদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল, মনে পড়ল রামকৃষ্ণদার কথা। আমার কাছেও একদিন কি উৎসাহ ভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল। নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল, চট্টলমায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে ! নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ'ল আমার এতদিনের স্বপ্ন

বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। আমি কত দিন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি—এমনি করে দেবতাদর্শনে চলেছি।

একটা ছোট কুটিরের অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হলাম! দেখলাম, নির্মলদা একটা লুঙ্গী পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরী দেখে আমি তো ভাবছি, মাঝি তোমাকে মেরে গয়নাপত্র চুরি করে নিল।" দু'জনেই হাসলাম। আমাকে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে বিধবা মহিলাটিকে (১) কি বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত শিশুটির মত হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার তো হাতে শাঁখা নাই কপালে সিন্দুর নাই, মহিলা যদি সন্দেহ করে!" কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিশুর মত উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এরা এত সহজে পরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে!

আমার আশা নিস্ফল হল না। নির্ম্মলদা বললেন, "মাষ্টারদা এখানে আছেন!" আনন্দে প্রাণ ভরে গেল।

নির্ম্মলদা পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল এনে দিয়ে বললেন, "হাত পা ধোও।" আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম, তখন বলছিলেন, "পা ধুলে না কেন? এমন লক্ষ্মীছাড়ামি করলে চলে না।" নির্ম্মলদা যখন এরূপ ধরণের কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাষ্টারদা ঘরের ভিতর এলেন। পরে নির্ম্মলদা আস্তে আস্তে বললেন, "প্রণাম কর।" সেই রাত্রিতে নির্ম্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলি নি, মাষ্টারদার সঙ্গেই বলেছিলাম। নির্ম্মলদা শুধু বলেছিলেন, "বাড়ীতে কি বলে এলে? কয়দিন থাকবে?" ইত্যাদি।

তারপর বললেন, "মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। এই মানুষটি অতল, এঁর তল পাবে না! আমাদের মত মানুষ ঢের পাবে, কিন্তু এঁর মত পাবে না। আমি উঁকে বলেছি তুমি খুব intelligent, দেখি, তাঁকে কতখানি move করতে পার।" আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভাল করেই জানি যে আমি intelligent নই। কিন্তু উল্টা চাপ দিয়ে বললাম, intelligent দেখাবার

(১) আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবী।—সম্পাদক।

এমন কি একটা সুযোগ দিয়েছেন যে বলছেন? তা ছাড়া আমি একটা মস্ত বোকা। মাষ্টারদা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে বলবেন যে, আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব জব্দ হবেন। শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর মাষ্টারদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খেতে গেলাম। আমি নির্ম্মলদার সঙ্গে গেলাম।

খুব ভোরে নির্ম্মলদা এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান্য বাজে কথাবার্ত্তা বলার পর আমার হাতে মেশিনটা দিলেন। Trigger টিপতে পারছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর বললাম, একেই তো মেয়েলোক লক্ষ্মীছাড়া, তারপর হাতটা আরও লক্ষ্মীছাড়া—আমার আঙ্গুলটাকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন, "নিরাশ হয়ো না, তিন দিনে সব ঠিক করে দেব। যদি আরও আগে তোমাদের পেতাম তবে অনন্তলালের হাতে তুলে দিতাম।" এই বলে অনন্তলালের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন, "অনন্ত একজন born revolutionist—ভারি সুন্দর। সুখেন্দুর (১) মৃত্যুর পর যখন আমরা meeting করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলেছিল, 'এ সব করে কি হবে? বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব, সেদিনই এর প্রতিকার হবে।'" তারপর বললেন, "তোমাদের অনন্তলালকে ভাল লাগত না।" খুব আশ্চর্য্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম, কে বলল আপনাকে? আমি তো বহুদিন ধরেই তাঁকে Indian Nepolean ভেবে শ্রদ্ধা করে আসছি। আরও কিছুক্ষণ মেশিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কয়েকটা যুযুৎসুও শিখিয়ে দিলেন।

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নির্ম্মলদা কি রকম প্রাণ খুলে হাসতেন, আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবলাম, এদের দুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম সত্যকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জানে।

নির্ম্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষটা এত বেশী দেখতাম যে, অবাক হয়ে যেতাম। আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কি ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলমানী

(১) বিপ্লবী সুখেন্দুবিকাশ দত্ত। ১৯২৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে একদল গুণ্ডাকর্ত্তৃক ছুরিকাহত হন। ৯ই অক্টোবর কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে [বর্ত্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল] তাঁর জীবনাবসান হয়!—সম্পাদক।

মেয়েলোককে কি কি বলেছিলাম এসব গল্প বলছিলাম আর মহোৎসাহে শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, "তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখার বড় ইচ্ছা ছিল। দেখি তোমরা কি কর, কিন্তু দেখলাম না।" যাঁদের ভেতরটি সুন্দর, তাঁরাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য্য গ্রহণ করে থাকেন। তারপর আমাকে রামকৃষ্ণদার কথা বলতে বললেন আর আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম। বললেন, "তুমি যখন রামকৃষ্ণের কথা বল তখন মনে হয় যেন গল্প শুনছি—আমার প্রতি রামকৃষ্ণের খুব regard ছিল। আমি যে ধূর্ত্ত তা সে জানত। তাই বলেছিল যে, সবার শেষে ধরা পড়ব। সত্যি ও যে কত বড় আগে বুঝি নি। একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, ও যখন কাউকে প্রণাম করত মাথাটা খাড়া থাকত।" বলতে বলতে নির্ম্মলদার চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল। এদের চোখের জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেন না এ অশ্রুজল মর্ত্ত্যের নয়—স্বর্গের। তারপর আমি নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে লাগলাম। ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভাল লাগত না। রোজই খেয়ে উঠে কাশত আর নির্ম্মলদা বলতেন, "কি যে খেয়ে উঠেই কাশতে আরম্ভ কর!"......এর পর থেকে খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্ণদা বলত, "নির্ম্মলদা, একবার কাশব, শুধু একটি বার।" নির্ম্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে আমার বড়ই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন।

রামকৃষ্ণদাকে কয়েদীবেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই সে বিদায় নিল। ওর জীবনের এদিকটা আমার কাছে নিতান্তই অজানা ছিল। নির্ম্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্ণদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পনা করতাম আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু ঘোরা-ফেরা করতে লাগলাম। নির্ম্মলদা একটু পরে উপরে যেতে বলে চলে গেলেন—আমি গিয়ে দেখি দু'তিনটি মনিব্যাগ খুলে টাকা গুণতে বসেছেন। আমাকে পাশে বসতে বললেন। মাষ্টারদার ব্যাগ থেকে কতকগুলি সিকি আর গিনি দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ, এগুলি হারালে অমঙ্গল হবে।" বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের টাকা আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মাষ্টারদার চেয়ে আমার বেশী টাকা আছে। আমি চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু মাষ্টারদা কারো কাছে চান না। মাষ্টারদার কাছে সব সময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময়

টাকা-পয়সার চিন্তায় আমার ঘুম পায় না—আর মাষ্টারদা শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন ঠিক একটি ছোট ছেলের মত। আমার ভারি চমৎকার লাগে।"

এসব কথা হচ্ছে, এমন সময় মাষ্টারদা নীচের থেকে এলেন। ওঁরা দুজনে অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, নির্ম্মলদা ঐ দিন দুপুরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন, "দেখ, আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি।" বললাম, তা তো দেখছিই, দুনিয়াতে আপনারা কিই বা না পারেন? কিন্তু আমার তো ভয় করছে। কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ-beltটি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চোখে খুব সুন্দর লেগেছিল, বাঙালী বীরের এই অসাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নতুন লাগল।

সন্ধ্যার একটু পরে নির্ম্মলদা ফিরে এলেন। তখন জালালাবাদের কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গের দেবতাগণ হয়ত সেইদিন এই লীলা দেখবার জন্য একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা targetting-এ বের হলাম। জ্যোৎস্না-দেবী অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচলখানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন। আমি যখন male dress নিয়ে নির্ম্মলদার সামনে এসে দাঁড়ালাম—কি ভীষণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন, "তোমাকে দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না। একটি ছোট্ট ছেলের মত লাগছে।" আমি বললাম, তাই নাকি? তবে আমি তোমার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে বললেন, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আমরা পাঁচজন ছিলাম। কে যেন বললে—পঞ্চপাণ্ডবের মত লাগছে। নির্ম্মলদা আমাকে বললেন, "তুমি সহদেব।" না, আমার অর্জ্জুন হতে ইচ্ছে হচ্ছে আর আর আপনি তো ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি নির্ম্মলদা বলেছিলেন, "Absconding life-এ এ রকম অভিযান আর হয় নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো। মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে দুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি।" এ-কথাটা আমার বড়ই লেগেছিল।

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম। আমাকে একটি গান করবার জন্য খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন। বললাম, পারব না। যা তা হবে। লক্ষ্মীটি, আমাকে সাধবেন না, শেষকালে আমার কষ্ট হবে। লক্ষ্মীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা দেখি, তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটি দৌড় দাও তো।" আমার খুব মজা লাগল, কারণ দৌড়াতে খুব ভালই পারি। দৌড়ে অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম,

বললেন, "বাঃ ! বেশ তো দৌড়াতে পার, action করার সময় এ রকম দৌড়াতে পারবে তো?" তারপর বললেন, "তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ ! আমরা এখন তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না।" বললাম, সে অধিকার তো আপনাদের আছেই। আপনাদের কাছে তো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। বললেন, "তোমাদের কিসের জন্য মারব? মারব না।"

যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিয়েছে। যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে এক একবার খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুলি করলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখনি সেদিনের কথা মনে হয়, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নির্ম্মলদার সঙ্গে targetting-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বললাম। দুপুরবেলা নির্ম্মলদার কাছে গেলাম। তখন বলেছিলেন "No revolutionary can die with satisfaction." ওটা খুব ঠিক কথা। অনেক কিছু করা হ'ল না, ভেবেই তারা সারা।

সেদিন বিকেলেই আমার চলে আসবার কথা। নির্ম্মলদা বললেন, "তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে। আমিও এখান থেকে চলে যাব। মাষ্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদে।" বললাম, একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। হাসতে হাসতে বললেন, "আমি মত দিলাম, এবার মাষ্টারদার মত লও।"

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সোনার বরণী রাণী গো···গানটা জানিস্? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে of which you are the eldest."

আমি বললাম, Of which আমি হলাম লোহার বরণী রাণী আর রমণ হল সোনার বরণী রাণী।

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন ! বললেন, "লোহার বরণী রাণীকেই তো আমার বেশী সুন্দর লাগে।" আমি ভীষণ হাসতে লাগলাম। নির্ম্মলদাও হাসলেন।

তারপর বললেন, "একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে দোকানদার

হয়ে বসে আছি। যেখানেই থাকি না কেন তোদের খবর নেব। আর যদি ধরা পড়ি, তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীঘির পাড়ে একটু দেখা দিস।"

অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্যদিকে গেল। নির্ম্মলদার আমাদের খবর নিতে হ'ল না, আমাদেরও দেখা দিতে হ'ল না।

সেদিন বলেছিলেন, "এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে one foot in grave. পৃথিবীর উপর সবাই এমনিভাবেই চলবে, থাকব না কেবল আমরা।"

নির্ম্মলদার কথাগুলো হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন তো ভাবি নি যে, তাঁর কথামত এত শীঘ্রই তিনি যাবেন। সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের স্পন্দন তেমনিভাবেই হচ্ছে—কর্ম্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনিভাবেই চলেছে—কিন্তু নির্ম্মলদা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

ক্রমে আমার আসার সময় হ'ল। আসবার সময় যখন নির্ম্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব—আমাকে আর কোনদিনও প্রণাম করো না।" বললাম, আচ্ছা, আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে কি হবে? মনে মনে করলে তো আর আটকাতে পারবেন না।

একটা কাগজে বেঁধে আমাকে একটা আশীর্ব্বাদ দিলেন। মাষ্টারদা বললেন, "এগুলো preserve করো।" কি আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথায় নিয়েছিলাম!

ওঁদের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওনা হওয়ার কথা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালবেলা আমার কাছে একবার খবর দেবার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর না পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হলাম। ভাবলাম—যদি বৃষ্টির জন্য আমাকে না নেন, তবে খুব বকে দেব। আবার ভাবলাম, হয়তো situation খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম, সীতাকুণ্ড যাব। মাকে বললাম—বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার করে দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম—নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরূপ কিছু করো না। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখলাম—তারপর কেবল ঘর-বার করতে লাগলাম।

প্রায় ৫-টার সময় লোক গেল। কি উৎসাহ নিয়েই না সেদিন রওনা হয়েছিলাম — নির্ম্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আসছি বলেই তো সেদিন এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম। উৎসাহ সব সময়ই তো থাকে, কিন্তু এবার যেন একটা অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি, ভাবলাম এরকম কাদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর কয়বার মিলবে কে জানে!

গন্তব্যস্থানে যখন গিয়ে পৌঁছালাম — একটা অফুরন্ত উচ্ছল হাসির শব্দ আমার কানে গেল। নির্ম্মলদা বললেন, "এই হল অপূর্ব্ব সেন, যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল।" চোখে দেখলাম, একখানা সহাস্য কচিমুখ, অন্তরের সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠেছিল।

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাষ্টারদা সেটা থেকে একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হল।

আমি ঘরের ভিতরে রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে বসে গেলেন। নির্ম্মলদা এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন। ওনার কাছে যে আশীর্ব্বাদ ছিল আমার মাথায় যখন তা সস্নেহে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন — ভাবলাম, স্নেহ বিলাতেও বুঝি কেবল এঁরাই জানেন!

রাত্তিরে আর বেশী কথাবার্ত্তা হ'ল না। মাষ্টারদা, নির্ম্মলদা দুজনেই বের হয়ে গেলেন। নির্ম্মলদাকে বললাম, আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন, "আর একদিন নেব।"

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল আর হাসির ফোয়ারা ছুটছিল। মহিলা আমার কাছে নালিশ করল, একটা ছেলে এসেছে কেবলই হাসে আর 'ভাল লাগে' বলে এমন একটা টান দেয় যে আর থামে না। শুনে ভোলার (১) প্রতি গভীর স্নেহে আমার মনটা ভরে গেল।

সকালবেলা ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি তখন অন্য ঘরে নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা খুব হাসছিল। তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন। এঁদের খাইয়ে তৃপ্তি আছে।

(১) ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের ডাকনাম — সম্পাদক।

নির্ম্মলদাকে বললাম, আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাসিটা আমার ভারি সুন্দর লাগছে। উনি তখন বললেন, "ছেলেটা ভারি Jolly আর Sincere – Comic করতে জানে। ওর কাছে থাকলে আমিও হাসি থামাতে পারি না। সম্প্রতি absconder-দের মধ্যে ও হ'ল best production – এ রকমের ছেলে দু'একটা থাকলে দেশ আলো করে রাখতে পারবে।"

নির্ম্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই অপূর্ব্ব সেন। রামকৃষ্ণদা আমার কাছে শুধু তার নামটা করেছিল : ভাবলাম, নির্ম্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্ণদা বলে দিয়েছে। বলা আর হ'ল না।

সেদিন সারাটা দুপুর নির্ম্মলদা আমাকে machine training দিলেন। কি করে কাপড়ের মধ্যে লুকাব, হঠাৎ বের করব – aiming ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এবার নির্ম্মলদা আমাকে মধ্যের অঙ্গুলী দিয়েই practice করালেন আর বললেন, "তোকে এই আঙ্গুল দিয়েই action করাব। Secretটি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমরা জানব। তারপর action হয়ে গেলে সবাই জানবে।" আমার খুব আনন্দ হ'ল। বললাম, আগের বার যখন আমি পারছিলাম না, তখন কেন এই আঙ্গুল দিয়ে practice করালেন না? নির্ম্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, "তখন তো মাথায় আসে নি।"

তারপর দু'জনে গল্প করতে বসলাম। তখন বিকেল হয়েছে। নির্ম্মলদা কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন, "এরা সব সময় এক সঙ্গে চলত, সদরঘাট এরাই আলো করে রেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেগরাকে আমরা টুলু, টাণ্টু, টুনু ও টেগরা বলে ডাকতাম। এতগুলিকে মেরে ফেলেছি আর ভাল লাগছে না।" ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন। তাই আর দেরী না করে নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নিলেন।

নির্ম্মলদা যখন এই সব ছেলেদের কথা বলছিলেন, তখন আমি বললাম, সত্যি চাঁটগার ওপর যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তার পেছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জনে রাখে? আমার কথা শুনে বললেন, "তোমার কাছে পাণ্ডিত্য ও ছেলেমানুষি দুটোই আছে, এটা আমার খুব চমৎকার লাগে।" নির্ম্মলদার এই 'চমৎকার' কথাটিও চিরদিন আমার মনে থাকবে। কথায় কথায় শুধু 'চমৎকার' বলতেন। ভাবতাম, যে নিজে চমৎকার তার কাছে সবই চমৎকার লাগে। ওখানে খুব smart চেহারার একটি ছোট ছেলে আসত। আমি নির্ম্মলদাকে

বললাম, এই ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। তখন বললেন, "মাষ্টারদা ওকে খুব আদর করেন – আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি বড় হয়ে গেছি, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমার মনেই থাকে না।" আয়না দেখলে মনে পড়ে, শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণ যাদের তাদের আবার কিসের বার্দ্ধক্য?

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুড়ী রান্নার প্রস্তাব হ'ল এবং রান্নার ভার আমার উপর পড়ল। শুধু খিচুড়ীটা রান্না হলেই সবাই মিলে একটা থালা করে খেতে বসে গেল। মহিলাটি বলছিল বেশী করে দেবার জন্য। ভাজাগুলো তখনো হয়নি বলে আমি নিষেধ করলাম। খাবার সময় ভোলার হাসি তেমনভাবেই চলছিল। নির্ম্মলদা খিচুড়ী খেয়ে এসে আমাকে বললেন, "খিচুড়ীটা বেশ ভালই হয়েছে। রান্না করতে কবে শিখলে? তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা আছেন।" বললাম, হ্যাঁ, আমাদের হাতে অন্নপূর্ণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্মা। খুব হাসতে লাগলেন।

আমি যখন আলুভাজা করছি, ভোলা এক টুকরা কাগজ নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল, "দিদি, I must take আলুভাজা।" অল্প করে দিলাম। আরো চাইলে পর বললাম, আর দেব না, খিচুড়ী খাওয়া হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল।

নির্ম্মলদা দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাত্রিবেলা আমাকে বলছিলেন, "ভোলা যখন তোমার সাথে কথা বলছিল আমার দেখে খুব ভাল লাগছিল।" আজ ভাবছি, যাবার আগে নির্ম্মলদা পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে এক সঙ্গে যাবে বলেই হয়ত এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণভরে দেখে নিল।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশী খেতে পারল না। পাতেই অনেক রয়ে গেল। ভোলা মহোৎসাহে বলতে লাগল, "আমি কাগজ বেঁধে সব রেখে দেব আর সকালবেলা খাব। Excellent হবে।" খাওয়া-দাওয়ার পর নির্ম্মলদা নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল। আমাকে ডেকে বললেন, – "তোর রান্না খেলাম, এবার তোর একটা গান শোনা।"

চির অভ্যাসমত আমি কিছুতেই গান করলাম না। যদি জানতাম যে, নির্ম্মলদা এ জীবনে আমাকে আর সাধতে আসবেন না তবে সে দিন যা হয়

একটা গেয়ে দিতাম? আমি জানতামই না যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই এঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেজন্য গান করিনি বলে আমার খুব খারাপ লাগল আর বললাম, দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না। ইতিমধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাষ্টারদা ওপর থেকে নেমে এলেন। নির্ম্মলদাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নির্ম্মলদা যখন একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়েছেন, আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যান। বললেন, "আচ্ছা চল, এস আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও।" বললাম, দাঁড়ালে কি হবে? শেষকালে তো তাড়িয়ে দেবেন।

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম; ভাবলাম, কবি নিশ্চয়ই এই আপনভোলা ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের হয়েই বলেছেন:

কেবল তব মুখপানে চাহিয়া
বাহির হ'নু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।

পরের দিন সকালবেলা (অর্থাৎ ১৩ই জুন, সোমবার) আমি যখন গেলাম সবাই তখন ঘুমাচ্ছেন। মাষ্টারদা আমাকে নির্ম্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে বসতে বললেন। নির্ম্মলদা ঘুমুচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর নির্ম্মলদা ঘুম থেকে জেগে বললেন, "তুমি যে কখন গোপনে এসে বসে আছ টেরই পাই নি।" তারপর বলতে লাগলেন:

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি—
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।

শুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম, নির্ম্মলদাও হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বাঃ! poetry-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি। আমরা ক্লাশে বসে কি রকম poerty লিখতাম, জানেন?

রাগ করেছিল ছেলেমানুষ
দেখবি ফিরে উড়বে ফানুস
কিম্বা খাবি লজেঞ্চুস্।

হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা তো ভয়ানক দুষ্টু দেখছি। মেয়েরা যে এত দুষ্টু হয় তা জানতাম না। আমার বড় দুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে একসঙ্গে দেখলাম না।"

সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলাম মনে হয় যেন নির্ম্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না। বললেন, "রমণের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে বলো, আমার উপর রাগ না করতে। তুমি আর ও প্রায়ই একত্র হবে, তোমরা দু'জনের কথা দু'জনকে সব বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে, Destiny-র against-এ কেউ যেতে পারে না। আমরা যতই করি না কেন, অবশেষে Destiny-র কাছে হার মানতেই হয়।"

তারপর বললেন, "রামকৃষ্ণের একটা কথা আজ তোকে বলব। আমাদের absconding life-এ কত রকম ইতিহাস যে নিহিত আছে, তা কেউ জানে না।" রামকৃষ্ণদার organise করা একটি ছেলে absconding life-এ কি ভাবে মারা গেল, কি ভাবে ওর সৎকার করা হল, রামকৃষ্ণদার মনে কি রকম লেগেছিল, একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল—একই পথের পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাড়া আর কেউ জানল না।

তখন বললেন, "রামকৃষ্ণ যখনই খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা ওকে ফুইট্যাদার (১) কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ও নিজে কিছুই বলত না। ফুইট্যাদাকে ও ভালবাসত এবং খুব respect করত।"

রামকৃষ্ণদাকে planchet-এ ডাকার কথা বলে বললেন, "তুই আর মাষ্টারদা আনিস—আমি নয়; আমার ভয় করে, যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয়!"

আশ্চর্য্য, এবার মাষ্টারদার সঙ্গে এই দুই দিন ধরে মোটেই কথা বলি নি। সারাক্ষণই কেবল নির্ম্মলদার কাছে বসেছিলাম। নির্ম্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না বলেই হয়ত এ রকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা ভোলার জ্বর এসেছিল। জ্বরসুদ্ধ সারাদিন comic করেছে। এই আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

(১) শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম 'ফুইট্যা'।—সম্পাদক

নির্ম্মলদা বললেন, "ভোলা হ'ল মাষ্টারদার assistant, ও বেশ ইংলিশ জানে। যা কিছু লেখা হয়, মাষ্টারদা ওকে দিয়ে পড়ান।" তারপর বকে যেতে লাগলেন, "ভোলা এর মধ্যে একদিন বাড়ী গিয়েছিল। বাড়ীতে ওর সাতজন বৌদি আছে। বাড়ীতে বৌদিদের বলেছিল, 'তোমরা সবাই fall-in কর; আমি command করছি।' ছেলেপিলে সবগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছিলাম।" শুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি—এরকম করে বিদায় নেওয়াটা বুঝি ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ী গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এল।

নির্ম্মলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন, "দেখ, আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতাম। এখন যেন brain-এ কিছুই নেই বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন চার দিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। লোকে বলত, এটার হ'ল কি?"

এই কথাগুলো যে নির্ম্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শুধু তাই ভাবছিলাম। জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে, কিন্তু এদের ভিতর যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আছে তার খোঁজ পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়! আর নির্ম্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল মনে হচ্ছিল:

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।

আমাকে একবার একটু অন্যমনস্ক দেখে বলেছিলেন, "তুমি এখন জীবননদীর এপারে, না ওপারে? জান, আমরা নদীর পারে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতাম, 'এই জীবননদীর এপারে থাকবি, না ওপারে যাবি?'" আজ ভাবছি, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে এরকম কথাই বের হয়। আমি বলেছিলাম, আপনারা যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন, "আমরা চলে গেলেও করতে পারবে। কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত মনে করি যে, আমরা না করলে চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজটা বাকী রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে female action." আমি বললাম,

আমার বড় মরতে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি একটা great chance হারিয়েছেন। এখানে যদি পুলিশ আসে আমি আপনার কাছ থেকে নড়ব না। নির্ম্মলদা বললেন, "কিসের জন্য মরবি?" কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে আর নির্ম্মলদাকে কোলে তুলে নেবে—আমাকে স্পর্শও করবে না।

তারপর আমাকে বললেন, "পিঠে হাত বুলিয়ে আমায় শান্তি দে।" আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, শান্তি দেব না, নেব। বললেন, "আমি আর এক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।" আমি বললাম, আমি আর এক জন্মে লক্ষ্মীছাড়া মেয়েলোক হব না।

এমনি করেই নির্ম্মলদা যাবার আগে সব কিছুই বলে গেলেন। আমাকে ভোলার জন্য সাগু জ্বাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু রান্না করছি, ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুন গুন করে গান করছিল। সাগুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। জীবনের শেষ খাওয়া খেয়ে নিল!

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। স্মৃতির বোঝা আর ভারি না করলে খুশীই হব এবং করলেও অনুযোগ দেব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্ম্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন! আমি বরাবর নির্ম্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম। নির্ম্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি তিনি তখন কোন্ অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন!

আমি বললাম, মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, পালিয়েছি বলে আরও লজ্জা করছে। মাষ্টারদা নিশ্চয় এ টের পেয়েছেন। নির্ম্মলদা হাসতে-হাসতে বললেন, "তাতে কিছু হবে না।" এমন সময় নীচে থেকে মাষ্টারদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে বললেন, "পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।" ভাবলাম, এই মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে! ওঁদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন না—মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে বললেন। কথামত নেমে গেলাম।

দুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। দুই একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর নির্ম্মলদার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম,

শোনামাত্র উপরে উঠতে গেলাম আর তিনজনে মিলে আমাকে চেপে ধরল। ওদিকে কি করুণ স্বরেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন! ওপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের কত ভয় দেখালাম—চোখ রাঙালাম। ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম। কিছুতেই আমায় ছাড়ল না। তারপর বললাম, আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। তবু ছাড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্দ্ধেক যেতে পেরেছিলাম—টান দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্ম্মলদার ডাক আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। নির্ম্মলদার কাছে যদি একটিবার যেতে পারতাম, জানি না আমায় কি বলতেন; কিন্তু আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন এর চাইতে বেশী আর কি চাই? ভগবান আমাকে একটি-বার নির্ম্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না! এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মত বেঁধে—ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিতে চায়। এমন সময় মাষ্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বড়ই আনন্দ হল। এতক্ষণ ওঁদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল তাঁরাও নেই। মাষ্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব···তোর life-টাও নষ্ট করলাম।" মাষ্টারদার পায়ে ধরে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, মাষ্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। চোখের একটি মাত্র পলকে ভোলাকে একবার দেখেছিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল! মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিনজনে রওনা হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্য তার লেলিহান্ জিহ্বা বের করেছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভদ্রার অভিমন্যুর প্রতি শত্রুর দল শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিল। আমাদের অভিমন্যু সহস্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জন দিল।

মাষ্টারদা দু'টি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মাষ্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম। আমার জীবন ধন্য হল। না—মাষ্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নাই! মাষ্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম। সবশেষে আমারই দু'

চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্ম্মলদা অতি অল্প দিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে। কেবলই মনে হয় যে, নির্ম্মলদা সব বুঝেছিলেন, তাই একটুও দেরী না করে যা কিছু বলবার বলে নিলেন। যতই মনে পড়ে যে, নির্ম্মলদা বলেছিলেন চাঁটগা শহরের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন ততই মন বলে ওঠে :

মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল
প্রাণভরা আশা সমাধি-পাশে।

মাস্টারদার ছায়াসঙ্গী নির্মল সেন

প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৯০০ সালে চট্টগ্রামের কোয়েপাড়া গ্রামে। পিতা রসিক সেন মাতা হরসুন্দরী দেবী। তিন ভাই দু বোন—নির্মল সবার ছোট। যখন বয়স বছর পাঁচ বাবা সপরিবারে চলে আসেন চট্টগ্রাম সহরের ফিরিঙ্গিবাজারে, তখন থেকে ঐখানেই ওঁদের স্থায়ী বাসস্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়—১৯১৮ সালে, নির্মল সেন তখন পড়তেন মেডিকেল স্কুলে। ঐ সময়ে চট্টগ্রামে গড়ে উঠল—একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ। এর কেন্দ্রিয় কমিটিতে ছিলেন সূর্য সেন (মাস্টার দা), অনুরূপ সেন, নগেন সেন (জুলু সেন) অম্বিকা চক্রবর্তী এবং চারুবিকাশ দত্ত। সেই জন্ম লগ্ন থেকেই নির্মল সেন ছিলেন এই দলের একজন প্রথম সারির সদস্য। ১৯২১ সালে গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ঠিক এই সময়ে সূর্য সেনের দলে ভাঙ্গন ধরে—মত ও পথে পার্থক্য তীব্র হয়। কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য চারুবিকাশ দত্ত, প্রমোদ চৌধুরীকে নিয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেন। সূর্য সেনরা থেকে যান যুগান্তর দলের সঙ্গে। গান্ধিজীর অহিংস আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়—যখন আমজনতা চৌরিচৌরায় আগুন দিয়ে থানা ঘেরাও করে বেশ কিছু পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। সূর্য সেনের দল তখন আবার ফিরে যান সশস্ত্র সংগ্রামের পথে—বিপ্লব করতে চাই—বন্দুক, রিভলবার-এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের, ঠিক হলো ডাকাতি করে এই টাকা সংগ্রহ করা হবে। আনোয়ারা থানার পড়ৈকরা গ্রামের হরিপদ মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন নির্মল সেন—এ ছাড়া যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন জুলু সেন, উপেন ভট্টাচার্য প্রমুখেরা—এই ডাকাতিতে নগদ অর্থ ও অলংকারাদিসহ মাত্র ৬০০/৭০০ টাকা পাওয়া যায়। ডাকাতি হয়েছিল ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে। পুলিশ টের পায়নি—কারা করেছে এ ডাকাতি।

পরের ডাকাতি হয় ১৯২৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। এটি ছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাহাড়তলীর কারখানার শ্রমিক কর্মচারিদের মাহিনার দিন। চট্টগ্রাম

কোর্টের ট্রেজারী থেকে বেতনের টাকা নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রেলের খাজাঞ্চী, দুজন কেরানী, সশস্ত্র পুলিশ সহ চলেছিল কারখানার দিকে—তখন সকাল দশটা—সামনে 'টাইগার পাস'। স্থানটি নির্জন—সেখানেই অনন্ত সিংহ দলবল নিয়ে লুট করে ব্যাগ ভর্তি ১৭০০০্ (সতেরো হাজার) টাকা এবং হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এই দলে থাকার কথা ছিল নির্মল সেনের—কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে সময়মত ঘটনাক্ষেত্রে আসতে পারেননি—এই অবাঞ্ছিত দেরীর জন্য নির্মলবাবু নিজেকে চিরকাল অপরাধী মনে করতেন।

১৯২৪ সালে বিপ্লবীদের সায়েস্তা করার জন্য বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের বলে একই দিনে অবিভক্ত বাংলার বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ধরা পড়েন। সূর্য সেন চারু-বিকাশ দত্ত আত্মগোপন করেন। দেবেন দে, নির্মল সেন মাস্টারদার নির্দেশে চলে যান বর্মায়। উদ্দেশ্য অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা। দেবেন দে বর্মা থেকে চলে গেলেন সিংগাপুর। নির্মল সেন রেঙ্গুনে (Rangoon) লুইস স্ট্রিটে ব্যবসা শুরু করেন। কারবার উপলক্ষ্য মাত্র। আসল কাজ গোপনে চট্টগ্রামে হাতিয়ার পাচার। এই সময় মণীন্দ্রনাথ মজুমদার লোকনাথ বল রাজেন দে তাঁর সঙ্গে বর্মায় মিলিত হন। নির্মল সেন মায়ের মতন ভালবাসতেন সাথী-মুক্তি সংগ্রামীদের তাদের আপদে-বিপদে বুক দিয়ে রক্ষা করতেন—তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ছিল এই, যখন বিশেষ কোন কাজ না থাকতো নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, রাত নেই, দিন নেই বেহুঁশ হয়ে একটানা তিন চার দিন মরার মত ঘুমোতেন। জেগে উঠলেই রাক্ষুসে ক্ষিদে তাঁকে পেয়ে বসতো—তখন যাকে সামনে পেতেন বলতেন এই সের দুই রসগোল্লা, একসের গোলজা বিস্কুট নিয়ে আয় জলদি। সব কিছু গোগ্রাসে গিলে তবে হতেন স্বাভাবিক।

১৯২৫ সালে নির্মল সেনের পিতৃবিয়োগ হয়। খবর পেয়ে বর্মা থেকে দেশে গেলে তাঁকে, লোকনাথ বল ও রাজেন দেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯২৮ সালে অন্য সকলের সঙ্গে তাঁরাও মুক্ত হন। সূর্য সেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন ১৯২৬ সালে—মুক্তি পান ১৯২৮ সালে। অনুরূপচন্দ্র সেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী হন ১৯২৬ সালে। অন্তরীণ অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে—১৯২৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জুলু সেন এই সময় দল ত্যাগ করেন। ফলে নতুন কেন্দ্রিয় কমিটি গড়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরপর কার্যকরি সমিতির সভাপতি হন

-সূর্য সেন। সহ সভাপতি—অম্বিকা চক্রবর্তী এবং অন্যান্য সদস্য হন নির্মল সেন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ।

১৯২৯ সালের মে মাসে রাজনৈতিক সম্মেলন হয়—তাতে সভাপতিত্ব করেন দেশ-গৌরব সুভাষচন্দ্র। এরপর এক দিন কেন্দ্রিয় কমিটির গোপন বৈঠক বসে—স্থির হয় ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ হবে 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সশস্ত্র অভ্যুত্থান। স্থির হয় রেল যোগাযোগ ছিন্ন করার নেতৃত্বে উপেন ভট্টাচার্য ও লালমোহন সেন, টেলিফোন ভবন আক্রমণের নেতৃত্বে অম্বিকা চক্রবর্তী, পুলিশ অস্ত্রাগার দখলের নেতৃত্বে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ, অকজিলারি ফোর্স অস্ত্রাগার দখলের নেতৃত্বে নির্মল সেন ও লোকনাথ বল, এবং ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বে নরেশ রায় থাকবেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাত দশটায় চট্টগ্রামে এ্যাকশন্ শুরু হয়। নিজেদের দলের এক-জনও হতাহত না হয়ে সমস্ত নেতারাই নিজ নিজ কর্তব্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

ডেথ প্রোগ্রামে জালালাবাদে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয় ২২শে এপ্রিল ১৯৩০। ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়ে—রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে নির্মল সেন লোকনাথ বলকে বুকে জড়িয়ে ধরে—বলে 'আজ তুমি যা দেখালে তার জন্য আমরা গর্বিত। হে বিজয়ী বীর, তুমি চিরদিন বিপ্লবী বাংলার স্বপ্নের মানুষ হয়ে থাকবে।'

১৯২২ সালে ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে নির্মল সেন বিপ্লবী সৈনিকদের অচল হয়ে যাওয়া বন্দুক লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে সচল করে যুদ্ধ জয়ের পথকে সুগম করেছিলেন।

জালালাবাদ যুদ্ধের সেনানায়ক লোকনাথ বল

বিনোদবিহারী চৌধুরী

লোকনাথ বল এক অকুতোভয় অবিস্মরণীয়, অনন্য নাম। বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের পরে যার বহুল প্রশংসিত ও প্রচারিত নাম চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়—জালালাবাদ যুদ্ধের সফল সেনানায়ক হিসেবে। জালালাবাদ যুদ্ধ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদী শোষক শাসক সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সঙ্গে ইহাই ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ সম্মুখ সংগ্রাম। শুধু তাই নয় এই সংগ্রামে বিপ্লবীদলের কাছে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয় এবং শক্র-সৈন্যের পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন, বিপ্লবী দলে নিহত বারজন এবং আহত তিনজন এবং শক্রপক্ষে আহত নিহতের সংখ্যা বিপ্লবীদলের চাইতে চারগুণ। গৌরবময় ইতিহাস তো নিশ্চয়ই—আর এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব অর্পণ করে-ছিলেন সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা তাঁর বিপ্লবী সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ দুরদৃষ্টি দিয়ে আমাদের অতি প্রিয় লোকাদা—লোকনাথ বলকে। অপূর্ব বিচক্ষণতা, অসীম সাহস, অনবদ্য দক্ষতা এবং সম্যক সামরিক বুদ্ধির পরিচয় তিনি সেদিন (২২শে এপ্রিল, ১৯৩০) দিয়েছিলেন তা স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরিয়েছে তাতে এই প্রচার-বিমুখ মানুষটির অবদান সত্যিকারভাবে আলোচিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে দূরে রাখার যেন চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে। ইতিহাস কেউ মুছে ফেলতে পারে না। অভ্রান্ত সত্য আপন আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এ ধ্রুব সত্য।

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান লোকাদা। তাঁর পিতা ৺যাত্রামোহন বলের সঙ্গে আমার কৈশোরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হাস্যরসিক অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, দীর্ঘদেহী যাত্রামোহন বল একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এই সুযোগ্য পিতার বীর সন্তান লোকনাথ বল এবং

হরিগোপাল বল (ট্যাগরা)। ট্যাগরা জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম শহীদ।

লোকনাথ বলের চেহারাখানি ছিল দেখবার মত। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নতপেশী-বহুল শরীর—ইউরোপীয়ান পোশাক বা মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত হলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে তিনি বাঙালি, গাড়ি করে মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত লোকাদা যখন Auxiliery force-এর ভিতর এসে দাঁড়ালেন পাহারারত সার্জেন্ট তাঁকে কোন উচ্চ অফিসার ভেবে সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উপবিষ্ট বিপ্লবী দল নেমে এলে তিনি সার্জেন্টকে গুলি করার আদেশ দেন। তার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলিগোলার শব্দ শুনে সার্জেন্ট ফেরেল রিভলবার হস্তে বিপ্লবীদলের মোকাবিলা করতে এসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী তার ও তার মেয়েদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন। বিপ্লবী লোকনাথ নিরীহ মাতৃজাতির উপর গুলিবর্ষণ না করতে বিপ্লবী সৈনিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে মাস্টারদা সার্জেন্ট ফেরেলের স্ত্রীর প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য লোকাদাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই ছোট্ট ঘটনা থেকে মাস্টারদা ও লোকাদার অন্তরের বৈভব এবং মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকাদার শারীরিক শক্তি ছিল কিংবদন্তীর মত। অক্সিলিয়ারী-ফোর্সের অস্ত্রাগারের দরজা উপড়ে ফেলেছিলেন রজত সেনের সাথে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে। লোহার শক্ত পাত তিনি দু হাতে পেঁচিয়ে সামান্য লোহার কুণ্ডলীতে পরিণত করতেন। দুটি মটর গাড়ি পুরো ফোর্সে দুজনে ড্রাইভার চালালে লোকাদা কোমরের সঙ্গে মটরের শক্ত দড়ি বেঁধে গাড়িকে চল, শক্তিহীন করে রাখতে পারতেন। বিভিন্ন স্থানে শারীরিক কসরৎ দেখাবার সময়ে লোকাদার এই শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীতে সকলের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করতে আমি দেখেছি। পরিমিত আহার, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও চেষ্টায় তিনি অটুট স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির অধিকারী হতে পেরেছিলেন এবং দলের বিপ্লবী যুবকদের শরীর চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

চট্টগ্রাম কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯২৬ সালে অন্যান্য নেতাদের সাথে তিনি বিনা বিচারে আটক হয়েছিলেন। ১৯২৮-এর প্রথম ভাগে অন্যান্যদের সাথে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সুমধুর ভাষণ, সুন্দর সুঠাম দেহ দেখে যে-কোন যুবক আকৃষ্ট হতো, তিনি খুব অল্প দিনের মধ্যেমাস্টারদার সাথি হতে

পেরেছিলেন, তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা, ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন গুণে। ১৯৩০-এর যুববিদ্রোহ ছিল একটি "Death Programme" মৃত্যুর কর্ম-সূচী, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে "Seizure of power"। ক্ষমতা দখল করে দেশবাসীকে স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ করে সারা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলিত করাই ছিল যুব বিদ্রোহের মহৎ উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে, শহীদ হওয়ার শপথই বিদ্রোহীরা গ্রহণ করে-ছিল। এসব লোকাদা জানতেন এবং তাঁর আপন ছোটভাই ট্যাগরাকে দলভুক্ত করে, মৃত্যুপথ যাত্রী হতে তিনি উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। কিরূপ প্রগাঢ় দেশপ্রেম থাকলে ইহা সম্ভব—সাধারণ মানুষ কল্পনা করতে পারবে না। যোগ্যতা ছিল বলে Auxiliary Force Army দখল করার মত একটি অতি দুরূহ কাজের দায়িত্ব মাস্টারদা তাঁকে দিয়েছিলেন। নির্মলদার (নির্মল সেনের) সহযোগিতায় তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছিলেন। এই বিপ্লবী দল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন মাস্টারদার নিজ মুখ থেকে নিজ কানে শুনেছি।

আমরা সব বিপ্লবী দল সফল কর্মকাণ্ডের পরে যখন দাসপাড়া পুলিশ প্রধান কেন্দ্রে হেড কোয়ার্টারে সমবেত হয়ে মিলিটারী কায়দায় ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির প্রেসিডেণ্ট প্রিয় নেতা মাস্টারদাকে গার্ড অফ অনার দিলাম এবং বিপ্লব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা যখন ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তার পরেই একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। পুলিশ আর্মির প্রয়োজনীয় রাইফেল ও গুলিগোলা সংগ্রহ করার পরে আর্মিতে পেট্রলের আগুন লাগিয়ে দেবার সময়ে (আণ্ডু) হিমাংশু সেন অগ্নিদগ্ধ হয়। হিমাংশু গুরুতর আহত, উচিত ছিল তার কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে অচিরে শেষ বিদায় দেওয়া। তা না করে আমাদের G. C. C ও general তাকে নিয়ে মটরে করে চলে গেলেন অন্যত্র সরিয়ে রাখার জন্য। ইহা ছিল বিপ্লবীদলের Himalayan Blunder. তাও সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার অনুমতি না নিয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শুধু একটি বিপ্লবীকে বাঁচাতে। যদিও আমাদের ছিল মৃত্যুর কর্মসূচী "Death programme"। এ ঘটনাটি না ঘটলে যুববিদ্রোহের ইতিহাস অন্যরূপ নিত।

জেলার শাসকশ্রেণী হতবাক। বিদ্যুৎগতিতে বিপ্লবীরা সামরিক কায়দায় জেলার কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিন্সন অক্সি-লিয়ারি ফোর্সে গিয়ে বিপ্লবী দল দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দৈবক্রমে রক্ষা পায়। মটর

থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু হালছাড়ার পাত্র বৃটিশরা নয়। পোর্টে গিয়ে wireless-এ কলকাতায় বিদ্রোহের খবর পাঠায় এবং জাহাজ থেকে machine gun এনে দামপাড়া পুলিশ লাইনের অদূরবর্তী water works জল সরবরাহের প্রধান অফিসের দুতলা থেকে machine gun দিয়ে বিপ্লবী দলকে আক্রমণ করে। বিপ্লবীরা এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেয় রাইফেলের গুলি বর্ষণ এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে। machine gun-এর গুলি বর্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত। অধৈর্য প্রতীক্ষায় মাস্টারদা ও বিপ্লব বাহিনী। Water-works Building থেকে দ্বিতীয় দফা আক্রমণ প্রতিহত করার পর মাস্টারদা অম্বিকাদা নির্মলদা ও লোকাদার সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যেহেতু পুলিশ এলাকার অবস্থান বিপ্লবীর পক্ষে সুরক্ষিত নয় এবং জেনারেল অফিসার অব কম্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন তাই দামপাড়া পুলিশ লাইন এলাকা রাত্রির অন্ধকারে পরিত্যাগ করে আমাদের অন্য জায়গায় সরে যেতে হবে। তদনুযায়ী অম্বিকাদার নেতৃত্বে আমরা পূর্বদিকের পাহাড়ী এলাকার দিকে মার্চ করার নির্দেশ পাই। রাত্রির অন্ধকারে শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে পাহাড়ে আমরা আশ্রয় নেই। ১৯ ও ২০।৪ তারিখে শহরে লোক পাঠানো হলো G. O. C.-র খবরের জন্য। কারো দেখা পাওয়া গেল না। পরের রাত্রিতে আমরা আর কিছু দূরে ফতেহাবাদ এলাকায় আর এক পাহাড়ে আশ্রয় নেই। আবারও শহরে লোক প্রেরিত হলো। কিন্তু গণেশদা, অনন্তদাদের খোঁজ মিলল না। বিপ্লব বাহিনী অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত। তাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। "আমরা তো পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার জন্য শপথ নেইনি।" মাস্টারদা সিদ্ধান্ত নিলেন। আর অপেক্ষা নয় ২১।৪ রাত্রেই আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে শহরে ঢুকে পূর্ব-নির্দ্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবো। বিপ্লবী বাহিনী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। একুশে রাত্রে আমরা আবার সহরের দিকে রওনা দেই। দুর্ভাগ্যবশত পথে ভোর হয়ে গেল। আমরা সেদিন ২২শে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। এই জালালাবাদ পাহাড় শীর্ষে বিপ্লবী দলের সাথে সরকারি গুর্খা ফৌজের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল অপরাহ্নে। সেই যুদ্ধের বীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন লোকাদা। বৃটিশ মিলিটারী সৈন্যবাহিনী মার্চ করে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে। মাস্টারদার নির্দেশে লোকাদা আমাদের পাহাড় ঘিরে স্ব স্ব পজিশান নিতে নির্দেশ দেন।

অসীম সাহস ও শৌর্যে এবং অপূর্ব রণদক্ষতা প্রদর্শন করে জেনারেল বল ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে গেলেন। রাইফেল রেঞ্জের কাছাকাছি শত্রু পৌঁছেছে দেখে তিনি হুংকার ছাড়লেন, তোমরা বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে গুলি ছোঁড় আর 'বন্দেমাতরম্', "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে শত্রুকে বুঝিয়ে দাও আমরা সংখ্যায় প্রভূত পরিমাণ। পাহাড় শীর্ষে শত্রু সৈন্য নিচ থেকে উঠতে চেষ্টা করে হত আহত হতে লাগলো। এক ঘণ্টারও অধিক কাল সংগ্রাম চললো। আমরা জয়ী। শত্রু পিছু হটলো। আবার শত্রুসৈন্য রাইফেলে বেয়নেট লাগিয়ে পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করল এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড় শীর্ষে machine gun ফিট করে অবিরাম গুলি বর্ষণ শুরু হলো। আমাদের রাইফেলের গুলি ততদুর গেল না। বৃষ্টির ধারার মত মেশিনগানের গুলি। আমাদের এগার জন শহীদ হলো। জেনারেল লোকনাথ বলের ছোট ভাই ট্যাগরাই প্রথম শহীদ। চীৎকার করে সে বলে উঠলো, সোনাভাই আমি চললাম তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। আরো কিছুক্ষণ লোকাদার তেজোদীপ্ত নির্দেশে আমরা রাই-ফেলের গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। পরে দেখতে পেলাম শত্রুরা আমাদের সঙ্গে পেরে না উঠে শিয়াল কুকুরের মত ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে। বিজয় উল্লাসে বিপ্লবীরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে পাহাড় শীর্ষ প্রকম্পিত করে তুল্লে সেনাপতি লোকনাথ বল সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন।

মাস্টারদা ও নির্মলদা ছুটে এসে লোকাদাকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে বলেছিলেন, "তুমি যে রণদক্ষতা ও বীরত্ব আজ দেখালে তাতে আমরা গর্বিত। হে বিজয়ী বীর তুমি বিপ্লবীদের স্বপ্নের মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবে।
তোমাকে দেওয়া দায়িত্ব তুমি সাফল্যের সাথে পালন করেছ। তোমাকে আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন।"

তখনই শহীদ বিপ্লবীদের গার্ড অব অনার জানান হলো এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো; জালালাবাদ পাহাড় পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করে ভবিষ্যতে গেরিলা পদ্ধতির মাধ্যমে ইংরেজকে পর্যুদস্ত করা হবে। আমরা পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। গুরুতর আহত ছিলাম। লোকাদা আদেশ দিয়েছিলেন দুজনে যেন আমাকে ধরে ধরে এগুতে সাহায্য করে। প্রতিটি বিপ্লবী সাথির প্রতি তাঁর কি অকৃত্রিম আন্তরিক দরদ।

তারপর দীর্ঘ ইতিহাস। পলাতক জীবন সুরু। লোকাদাকে চট্টগ্রামে লুকিয়ে

রাখা সে এক অসম্ভব ব্যাপার।

তাঁর অতি সুন্দর সুঠাম চেহারার জন্য সবার পরিচিত। তাই ইউরোপিয়ান পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত করে তাঁকে কলিকাতায় পাঠান হয়—নানা ঝুঁকি নিয়ে। নিরাপদে তিনি কলিকাতা পৌঁছান এবং যুগান্তর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা (ভূপেনদা) ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সহায়তায় ফরাসি চন্দননগরে, আশ্রয় পান। দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদলের। এ গোপন আশ্রয় কেন্দ্রের খবর পুলিশ জেনে ফেলে। তিনি চন্দননগরে গ্রেপ্তার হন অন্যান্যদের সাথে। চট্টগ্রামে তাঁকে পাঠানো হয়। এবং প্রথম চট্টগ্রাম আর্মারীরেড মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

পরে তাঁকে অন্যান্যদের সাথে আন্দামান জেলে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। আন্দামান সেলুলার জেলে প্রায় সব বন্দী কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে। কিন্তু লোকনাথ বল ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদে নয়। জেলে বন্দীদের বাংলা সঞ্জীবনী ও ইংরেজি Statesman কাগজ পড়তে দেওয়া হতো। কোন কোন খবর কাঁচি দিয়া কেটে রাখা হতো। অন্য দেশীয় কাগজ জেলে ঢুকা নিষেধ। কিন্তু Markist literature-এর জেলে অবাধ প্রবেশ। মনে হয়েছে Intelligence Department যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জেলে এই বই সরবরাহ করেছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের চাইতে তৎকালীন পুলিশ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক শ্রেণী নিয়ে আন্দোলন নিরাপদ মনে করেছিল, মনে হয়। যাইহোক লোকনাথ বল জেল থেকে বেরিয়ে এসে কম্যুনিস্ট দলে যোগদান করেননি। আমরা যারা কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী নই তাদের সাথে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। আমরা কিন্তু গান্ধীজির কর্মপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে কংগ্রেসের কাজেই যোগ দিয়েছিলাম। তিনি মানবেন্দ্র রায়ের M. N. Roy-এর Radical Party-তে যোগ দেন। এই দল বাংলাদেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে বা প্রভাব ফেলতে পারেনি। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কলিকাতা করপোরেশনের উচ্চপদে চাকুরি গ্রহণ করেন। কর্মস্থানে সুশাসক হিসাবে প্রশংসা লাভ করে, ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

বিপ্লবী ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সদালাপী বিনয়ী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, আত্মভোলা ও নিরহঙ্কার। এমন একজন রাজনৈতিক নেতা দেশে বিদেশে খুবই বিরল।

মাস্টারদা ও লোকনাথ বল

সতীভূষণ সেন

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মাস্টারদার জন্ম। সর্বদেশে ও সর্বকালে মধ্যবিত্তরাই জাতির কৃষ্টি বহন করে থাকে। প্রভাতে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। সারা বছর অর্ধাহারে বেঁচে থাকে। জীবনের সব সৌন্দর্য ও আনন্দ নিঃশেষ করে দিয়ে, জাতির জ্ঞান ও কৃষ্টির বর্তিকা জ্বালিয়ে রাখে। এরাই জাতির মেরুদণ্ড, ন্যায়-নীতির কর্ণধার, সমাজের রক্ষক। এরা রাজভক্ত, ধর্মভীরু ভদ্রসন্তান।

আবার যখন জাতির জীবনে অন্যায় অবিচার ও পাপ বাসা বাঁধে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তখন সেই পাপের উদ্ধত শাসনকে প্রতিহত ও পরাজিত করবার জন্য, এই মধ্যবিত্তের মাঝেই এমন একটি আবির্ভাব ঘটে, যিনি নিজের পথ নিজেই সৃষ্টি করেন। তিনি জগতে আনেন অশান্তির অভিশাপ, ঘটান বিশৃঙ্খলা। আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠে, রাজশক্তি সমাজবন্ধন লোকাচার সব ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে দেন। সেই ভগ্নস্তূপের উপরে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, জাতি নবজীবন লাভ করে।

মাস্টারদা ছিলেন তাঁদেরই একজন। সাধারণ বাঙালির চেয়ে ক্ষুদ্রাকায়, ক্ষীণদেহ একটি ব্যক্তি। দেহের বর্ণ শ্যাম, মাথার সামনে চুলের চাইতে টাক বেশি, উন্নত ললাটের গাম্ভীর্য আরো বেশি করে চোখে পড়ে। পরিচ্ছদ অমার্জিত, চেহারাতেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যে দেখলেই মাথা নত হয়ে আসবে। স্বভাবত গম্ভীর, কথা বলেন কম। শান্ত সমাহিত মুখে মৃদু হাসি, চোখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি, অথচ সব ছাপিয়ে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ।

সেদিন মাস্টারদার আর এক মূর্তি দেখল লোকনাথ। মাস্টারদা তাকে বলেছিলেন অতুলকে ডেকে আনতে। [অতুল নামটা কাল্পনিক, ঘটনাটি সত্য] অতুল এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। নিমেষে দুহাত ছিটকে গেলেন মাস্টারদা। চোখ দুটি এমন জ্বলে উঠল যে, হতবুদ্ধি হয়ে গেল অতুল। আরম্ভ হল তাঁর তিরস্কার, যাঁর সম্মুখে শক্তিমান যুবক অতুল থর থর করে কাঁপতে লাগল, একটু প্রতিবাদ

করতে পারল না। ঐ অতোটুকু মানুষের মধ্যে যে, এতখানি তেজ ও ক্রোধ থাকতে পারে, তা লোকনাথের কল্পনার অতীত।

লোকনাথকে আদেশ করলেন, "য়্যারেস্ট হিম"! লোকনাথ পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কাঁধের উপর হাত রাখল, বলল, "ইউ আর আণ্ডার য়্যারেস্ট।"

"লোকনাথ, তুমি ওর সঙ্গে যাও। রিভলভারটা নিয়ে আসবে। সব সময় সঙ্গে থাকবে, পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করবে।"

কিন্তু গুলি করবার অস্ত্র তিনি লোকনাথকে দেননি। লোকনাথের সঙ্গে শুধু একখানি ছোরা। কোমরে গোঁজা, পাঞ্জাবীটা সেখানে উঁচু হয়ে উঠেছে। তারই উপর নির্ভর করে লোকনাথ অতুলকে 'এসকর্ট' করে নিয়ে চলল। প্রায় ১৫ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি, অনাহার, অনিদ্রা। অবশেষে সিলেটের একটি ছোট শহর থেকে নিষিদ্ধ বস্তুটি সংগ্রহ করে আনলো লোকনাথ।

একটু পুরানো কথায় ফিরে যাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্থির করেছিলেন, আর রক্তাক্ত বিপ্লব নয়; এবার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নামবেন। তাই বলে অস্ত্রশস্ত্র যার কাছে যা ছিল, তা কিছু আর নদীতে বিসর্জন দিলেন না।

তলোয়ারকে মাটির নিচে পুঁতে রাখলে যুদ্ধ বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটি লাঙ্গলের ফলা হয়ে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ করে না। তার জন্য চাই মানুষের প্রত্যয় ও আগ্রহ। বিপ্লবী ছেলেরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল, কিন্তু আন্দোলনের ভাবের বন্যায় ভেসে গেল না।...তলোয়ারে মরচে পড়তে লাগল, ছেলেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বিদ্রোহ করতে চাইল। কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করতে হল মাস্টারদাকে। কিন্তু তাঁরই কি চুপ করে থাকতে ভাল লাগছিল! তিনিও কি নদীতীরে কুটিরে বসে আগামী অগ্নিময় দিনের স্বপ্ন দেখছিলেন না? কিন্তু যাঁদের তিনি বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের নির্দেশই বা অমান্য করবেন কি করে, আরো কিছুদিন না দেখে?

চাটগাঁর রেল ও স্টিমার স্ট্রাইক ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে ওখানকার অসহযোগ আন্দোলনে ইতি পড়ল। অনেকের চাকরি গেল, অনেকের ব্যবসা নষ্ট হল। আর্থিক ক্ষতি হল বহুজনের। লেখাপড়ায় ইতি পড়ল বহু ছেলের। বিরাট জমজমাট ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেল। একবছরে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন ভাঙলো।

রণক্লান্ত মধ্যবিত্ত, নিজ নিজ জীবনের ছিন্ন সূত্রগুলি জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময় সুযোগ পেল গুণ্ডারা। সহরে সিরাজ্যা গুণ্ডা, গ্রামে অ্যাজাচোরা ডাকাত। 'চা'য়ের দোকানে এদের ঘাঁটি, গাড়িওয়ালা সাম্পানওয়ালা এদের বাহিনী, ধনী সওদাগরেরা পৃষ্ঠপোষক, প্রধান শিকার হিন্দু। হিন্দু ছেলেরা পথে ঘাটে অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, মেয়েরা ইস্কুলে যেতে ভয় পায়। চায়ের দোকান নেই এমন পথ কোথায় শহরে? কান বন্ধ করে পথ চললেই কি সব সময় পথ পাওয়া যায়?

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু, ছোটখাটো মানুষ এরা। ছোটখাটো আশা নিয়ে, ছোট ছোট সুখের সন্ধান করে। পরাধীন দেশের মানুষ, দেশ থেকেও নেই। দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি নেই, পদে পদে বিভীষিকা। ভবিষ্যতের দিকে চায়, দেখে অনিশ্চয়তার নিবিড় অন্ধকার। ...পুলিশ কি ছিল না দেশে? নিশ্চয়ই ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে খাটুনীর পরে হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছিল। হয়ত বা মজা দেখছিল।

সরল মানুষ সূর্য সেন। সরলতাই অবশেষে তাঁকে পথের সন্ধান দিল। ভয়কে জয় করেছিলেন, তাই সত্যকে অনুসরণ করতে কোথাও বাধলো না। গুপ্ত সমিতির স্বাভাবিক গোপনতা পরিহার করে সামনে এলেন। উচিত অনুচিত বিবেচনার সময় আর নেই। মানুষের শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে, মানুষের পাশবিকতার সামনে।

কে দাঁড়াবে? তাঁর সম্বল তো কয়টি ইস্কুল কলেজের ছেলে! মা-বাবাকে শুধাও, শুনবে ছেলেরা নিরীহ দুর্বল। হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, উল্টে প্রশ্ন করবে, "হিন্দু আবার কবে মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে লড়তে পারে?

তখনো ফিজিক্যাল কালচার ক্লাবে চাটগাঁ ছেয়ে যায় নি। তখনো লোকনাথ যুবক দলে প্রিয় "লোকাদা" হয়নি; দুহাতে দুটি চলন্ত মোটর থামিয়ে শক্তির পরীক্ষায় জনতাকে বিস্ময়মুগ্ধ করেনি। ...হঠাৎ একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা—

"আরে ভাই যা পিটালো সিরাজ্যার দলকে লোকা বল।"

"চুপ চুপ, কে কোথায় শুনে ফেলবে..."

"সিরাজ্যার বাড়ীতে চড়াও হয়ে হাণ্টার দিয়ে পিটিয়েছে। সিরাজ্যা গুণ্ডা

চেঁচিয়েছে "আমি না, আমি না ; আর করবো না !"

চোখের পলকে ছোট ছোট নিরীহ মানুষদের দুনিয়ার রং বদলে গেল। তাদের ঘরের ছেলের এত তেজ ? পথে ঘাটে দোকানে তাচ্ছিল্য অপমানকে সহ্য না করলেও তো চলে ! গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠল ! মনে মনে বলল, দীর্ঘজীবী হোক্ লোকনাথ।

মাস্টারদার নাম তখনো জনতার কাছে পরিচিত হয়নি। কিন্তু তাঁর কুটির তরুণদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ছেলেদের সদ্যজাগ্রত আগ্রহে তিনি সমিধ সংযোগ করেন। ছেলেদের শুষ্ক শঙ্কিত মনে নতুন আশা নতুন সাহস পল্লবিত হয়ে ওঠে। তারা ক্লাবে যায়, শরীর চর্চা করে। ক্লাবে ক্লাবে শহর ও পল্লী ছেয়ে যায়। ছেলেদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের অন্তরালে, বাড়িতে স্কুলে মাঠে ক্লাবে, ভাবী "ডেথ প্রোগ্রামে"র গোপনে চাকা ক্রমশ দ্রুততর গতিতে আবর্তিত হতে আরম্ভ করে, যার পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখা জালালাবাদের যুদ্ধ। ইতিহাসের দুটি নাম—বিপ্লবী সরকারের প্রেসিডেন্ট সূর্যকুমার সেন, কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল লোকনাথ বল।

ক্ষণিকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়

লোকনাথ বল

২২ এপ্রিল ভোরবেলা আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৮ই (১৯৩০) এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল করার পর চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হয়। তারপর তিন দিন বিভিন্ন পাহাড়ে আমাদের দিন কাটে। এ ক'দিন একরকম অনাহারেই আমাদের থাকতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের দু'একটা কাঁচা আম এবং ঘোলা জল এই ছিল আমাদের খাদ্য ও পানীয়। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে উঠার সময় বহু গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমরা জানতাম আমাদের সংবাদ সেদিন পুলিশের কাছে গোপন থাকবে না। তাই একটা চরম হিসাবনিকাশের জন্য আগে থেকেই সেদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। অবশ্য প্রস্তুত হয়েছিলাম বললে কথাটা ঠিক হবে না। তিন দিনেব অভুক্ত, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ফলে পরিশ্রান্ত, আমরা তখন একরকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।...বেলা অনুমান পাঁচটা, হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের রক্ষী বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি করে উঠল। যে যেখানে ছিলাম ছুটে এসে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখলাম, একদল সৈন্যবাহিনী সঙ্গীন উঁচিয়ে আমাদের পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সৈন্যবাহিনী যখন আমাদের রাইফেলের গুলির পাল্লার ভিতর এসে পড়ল তখন আমি গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলাম। আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হতেই সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। কিছুদূর গিয়ে তারা পেল একটি পাহাড়ি খাল। সেখানে তখন জল ছিল না বললেই হয়। সেই খালের ভিতরে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণের জবাব সুরু হল। অনুমান পনের মিনিট পরস্পর গুলিবর্ষণের পর আমরা হঠাৎ লুইসগানের গুলিবর্ষণের আওয়াজ পেলাম। প্রথমেই আমার ছোটভাই 'টেগরা' আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাকে সম্বোধন করে 'টেগরা' বলল, 'সোনাভাই! আমি চললাম, তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করো।' লুইসগানের গুলিবর্ষণ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ত্রিপুরা সেন,

নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত এবং মতি কানুনগো আহত হয়ে পড়ে গেল। তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি, জাতির পরাধীনতার, জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হল স্বাধীনতাকামী শিশুদের রক্তে।...

তখন অনুমান সাতটা। হঠাৎ সরকারি সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে তিন বার হুইসেলের আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ষণের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হল। আমাদের 'বন্দেমাতরম্' এবং 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! একদিকে তিন দিনের অভুক্ত, পথশ্রমক্লান্ত জনপঞ্চাশেক বিপ্লবী (আমাদের অধিকাংশই ছিল পনেরো ষোলো বছরের বালক), অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ, রণবিদ্যায় পারদর্শী গভর্ণমেণ্টের বাছাই করা সৈন্যবাহিনী। ...পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের সেদিনের জয়লাভ কম গৌরবের বিষয় নয়। জালালাবাদের শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে তাদের প্রাণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে সেদিন প্রমাণিত করেছিল ভারতবর্ষের তরুণরা কাপুরুষ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য, জাতির কলঙ্ককালিমা ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। জালালাবাদের শহীদরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্রম ডাকাতির ও খুনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারি উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে খুন করা একটা আদর্শ বিপ্লবী কার্য বলে পরিগণিত হত। আমাদের মনে হল, প্রচলিত আন্দোলনের গতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক। ক্ষমতা হস্তগত করাই সমস্ত বিপ্লবী কার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করলাম চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করব। আক্রমণের দিন ঠিক হল ইংরেজি ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত দশটা। ঐদিন ছিল গুডফ্রাইডে (Good Friday)। একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল ঐ দিনটার সাথে জড়িয়ে। আইরিশ প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর ইস্টার বিদ্রোহের রক্তরাঙা স্মৃতি আমাদের তরুণ প্রাণে লাগাল আগুনের ছোঁয়াচ।

চট্টগ্রামের রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল নির্মলদা (শ্রীযুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাস্টারদা (সূর্য সেন) ছিলেন আমাদের সর্বোচ্চ নেতা। আমাদের কার্যের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাঁরই নির্দেশে। নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি। ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটের সময় আমি স্থানীয় ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে বললাম, ঐ দিন রাতে আটটার সময় গাড়ি নিয়ে আমার বাসায় যেতে। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে। সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল (মাখন), ফণি নন্দী, সুবোধ চৌধুরী এবং আমি সামরিক পোশাক পরে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ সামরিক কর্মচারীর পোশাক এবং অন্যেরা সৈন্যের পোশাক পরিহিত ছিল। আটটার সময় ট্যাক্সি এলে আমরা গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে পাহাড়তলীর দিকে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলাম (পাহাড়-তলী স্টেশন চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)। রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখের পথ গিয়ে যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম, অস্ত্রাগারের অবস্থা অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক। আমাদের গাড়ি যখন পাহাড়তলী স্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল. তখন আমি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। গাড়ি থামতেই আমি এবং রজত গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের দিকে রিভলবার লক্ষ্য করে তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। ড্রাইভার আমাদের নির্দেশ পালন করল। আমরা ড্রাইভারকে রাস্তার পাশের বাঁশ খেতে নিয়ে যাই এবং তার হাত-পা বেঁধে ক্লোরোফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই।

প্রায় দশটার সময় আমাদের গাড়ি রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সাইড্ গেটে গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়তলী থেকে ফিরে আসবার সময় গাড়ি চালাবার ভার নিয়েছিল জীবন ঘোষাল। অস্ত্রাগারের সম্মুখে আমাদের ছয় জন সাথি আমার নির্দেশানুযায়ী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন এসে ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ি অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার জন্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'Halt, who comes there? (থাম! কে আসছে?)।' তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'Friend (বন্ধু)।' তারপর আমাদের গাড়ি অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল।

আমি একা গাড়ি থেকে নেমে অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত। রক্ষীকে আমি ডাকলাম, 'Sentry, ইধার আও (রক্ষী ! এদিকে এসো)।' রক্ষী আমার সম্মুখে এসে সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল। তার ডান হাত রাইফেলের বাট্ স্পর্শ করা মাত্রই আমি বাঁ-হাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ডান হাতে তার বুকের সামনে রিভলভার লক্ষ্য করে বলি—'আমরা স্বদেশী, অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও।' আমি তাকে রাইফেল ছেড়ে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল। তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করি, সে আহত হয়ে পড়ে গেল। অন্য তিন-জন রক্ষী তাদের রাইফেল ধরবার চেষ্টা করলে আমি এবং আমার সাথিরা ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম। আমাদের প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল তার ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল। আমি তাকে হুঁশিয়ার করে বললাম, 'আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সভ্য। নেতার হুকুমে অস্ত্রাগার দখল করছি। যদি আমাদের কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা কর, তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমার কথা শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনতিবিলম্বে আক্রমণ করার জন্য তার রিভলবার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে তাঁর এবং তাঁর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের মায়ের মত ; আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা তাঁকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে যান, কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না।'

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষের উপর। ঐ অস্ত্রাগার ছিল একটি ছোট পাহাড়ের উপর। রাত দশটার সময় আমাদের সাথিরা একখানা গাড়ি করে অস্ত্রাগারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁরা দূর থেকে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন, রক্ষী আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাদের সাথিরা তখন গুলিবর্ষণ করতে করতে অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে যান। অস্ত্রাগারের অন্যান্য রক্ষীরা তখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ অস্ত্রাগারকে

আমাদের সামরিক হেডকোয়ার্টারে পরিণত করা হল এবং আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম, আমাদের প্রিয় মাস্টারদা নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর। রাত দশটার সময় তিনি এবং আর কয়েকজন সাথী টেলিগ্রাফ অফিসে যান এবং রিভলভার দেখিয়ে এক্সচেঞ্জ বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সরিয়ে হাতুড়ির সাহায্যে এক্সচেঞ্জ বোর্ড চুরমার করে দেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর বন্দুক নিয়ে ছুটে আসেন; কিন্তু আমাদের সাথিদের গুলিবর্ষণের ফলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

১৮ই এপ্রিলের দু'দিন আগে আমাদের কয়েকজন সাথি রেলওয়ে লাইন কেটে দেবার জন্য শহর পরিত্যাগ করে যান। ১৮ই এপ্রিল রাত ১০টার সময় তাঁরা ধুম এবং লাঙ্গলকোটের মাঝামাঝি রেলওয়ে লাইন কেটে দেন।

চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হল। পরে আমরা শুনেছিলাম, চট্টগ্রামের সমস্ত ইংরেজ পুরুষ, রমণী ও শিশুরা সমুদ্রগামী একখানা জাহাজে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আজীবন পরাধীনতার দূষিত হাওয়ায় লালিত-পালিত হয়ে জীবনে সেদিন আমরা প্রথম পেলাম স্বাধীনতার আলো, স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ার প্রথম পরশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গড়ে উঠেছিল সেই অনুভূতি!

লোকনাথ বল

পিতা—৺প্রাণকৃষ্ণ বল, মাতা—৺কুসুমকুমারী,

স্ত্রী—শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমা বল ।

ছেলে—মেজর ডাঃ হিমাদ্রি বল,

মেয়ে—শ্রীমতী শিখা সিংহা ।

জন্ম—৪ঠা মার্চ ১৯০৮ ইংরেজি,

মৃত্যু—৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ইংরেজি ।

তিন ভাই, দুই বোন, বড়ভাই—ভোলা, ছোটভাই—হরিপদ (টেগ্‌রা), লোকাদা—ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয় ।

পিতা নোয়াখালীতে (বর্তমান বাংলাদেশ) সরকারি চাকুরি করতেন, তাই লোকাদার ও টেগ্‌রার পড়াশুনা নোয়াখালি জিলা স্কুলেই হয় । বড়ভাই ভোলা চট্টগ্রামে রেলওয়েতে চাকরি করতেন ।

লোকাদা ছেলেবেলায় স্বদেশী কবিতা লিখতেন—সেগুলো সুযোগমত আবৃত্তিও করতেন । ভাল ফুটবল খেলোয়াড়—ব্যাকে খেলতেন, ছাত্র হিসেবেও ভাল । প্রথম তিন জনের মধ্যে তাঁর স্থান । খেলোয়াড় হিসেবে স্কুলের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছেন । এক কথায় বলা যায় তিনি সবার প্রিয়, সবার আপন । একজন ছাত্র নেতা ছিলেন । স্কুলের ড্রামায়, থিয়েটারেও তিনি অংশ নিতেন ।

বি. এ. পরীক্ষা পাশ করে কলিকাতায় আইনবিদ্যা পড়তে সুরু করেন । প্রয়োজনে তিনি গুণ্ডাদের ভালমতো । তুলোধুনা করতেন—এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে থাকতেন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ । লোকনাথ বলের দেহে এত ক্ষমতা ছিল যে—যার ফলে নিজবলে সচল মোটর গাড়ী ধরে রাখতে পারতেন । তিনি মাস্টারদার দলে আসেন দেওঘর ষড়যন্ত্রের অন্যতম অভিযুক্ত সুখেন্দু দস্তের হাত ধরে ।

সদর ঘাট ক্লাব থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে ব্যায়াম প্রদর্শন করা হতো

সদর ক্লাবের সভ্যরা নানারকম অঙ্গ সঞ্চালনের ক্রিয়াকলাপ দেখাতেন।

লোকনাথবল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নরেশ রায় প্রমুখের ক্রীড়া প্রদর্শনীতে উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত ঘন ঘন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতো।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ ইংরেজি লোকনাথ বলের নেতৃত্বে অক্সিলিয়ারী ফোর্স দখল (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে) এবং ২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জালালাবাদে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সেনাপতি হিসাবে (মাষ্টারদা সূর্য সেনের সারথ্যে উভয় অভিযান ও সংগ্রামে) তিনি ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিলেন—অবিভক্ত ভারতবর্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য নজির।

ব্রিটিশ সরকার উপরোক্ত উভয় অভিযান ও সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে ও অন্যান্য সংগ্রামী কার্যকলাপে অভিযুক্ত করে লোকনাথ বল ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে "আন্দামানে" সেলুলার জেলে প্রেরণ করে।

আন্দামানে থাকাকালে লোকনাথ বল নানা রাজনৈতিক বই পড়ে এম. এন. রায়ের রেডিক্যাল পার্টির প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে কলিকাতায় এম. এন. রায়ের দলে যোগ দেন।

অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সে সময় কলিকাতায় 'চট্টগ্রাম ইউনিয়ন' নামে একটি সংস্থা ছিল। সভাপতি ছিলেন লোকাদার গ্রামবাসী ৺চন্দ্রশেখর সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সরকারি এড্‌ভোকেট, সম্পাদক ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য—ছাত্রনেতা ৺শান্তিরঞ্জন সেন।

শান্তি সেন ও মহেন্দ্র বড়ুয়া—চট্টগ্রাম ইউনিয়নের কার্যকরী সভা না ডেকে 'শ্রী' সিনেমা হলে লোকাদাকে বাদ দিয়ে অম্বিকাদা, গণেশদা ও অনন্তদাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাতে চট্টগ্রাম ইউনিয়নের সভাপতি চন্দ্রশেখর সেন ক্ষুব্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে লোকাদাকেও একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

লোকাদা তখন কিছুদিন কলিকাতায় থেকে রেডিক্যাল পার্টি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। সে সময় কানুনগো পাড়ার (চট্টগ্রাম জেলার) ৺শিশির দত্ত ও ৺শচীন্দ্র গুহ তাঁকে দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন। একদিন শ্রীসাধনপ্রসাদ দত্ত ও শ্রীচিত্তরঞ্জন

দাস (তৎকালীন জুনিয়ার) লোকাদার সঙ্গে দেখা করেন এবং কথাবার্তা বলার সময় বলেন—"আমরা কংগ্রেস করি"। উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে আসার সময় লোকাদাকে বললেন—"মাঝে মাঝে এসো।"

শ্রীসাধন দত্ত ও শ্রীচিত্ত দাস ফেরার পথে উভয়েই লোকাদার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মধারা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেছিলেন এই বলে—"চট্টগ্রামে রেডিক্যাল পার্টির" ভিত ভাল না—সেখানে তাঁর সম্বর্ধনা সভায় লোকের ভিড় হবে না—বিশেষ সাড়া পাবেন না—তিনি কলিকাতায় ফিরে এলে দেখবে—ঠিক কংগ্রেসে যোগ দেবেন। হলোও তাই।

লোকাদা কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম যান—রেডিক্যাল পার্টির সদস্যেরা—শিশির দত্ত, শচীন গুহ, ডাঃ বনপ্রিয় ভট্টাচার্য, অরুণ দস্তিদার (টুলু) প্রমুখেরা চট্টগ্রাম শহরের লালদিঘীর ময়দানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। অনুরূপ সম্বর্ধনা তাঁর জন্মভূমি ধোরলা গ্রামেও হয়।

এই দুই সম্বর্ধনার যাবতীয় ব্যয়ভার তদানীন্তন "কানুনগো এণ্ড কোং"-এর অন্যতম অংশীদার স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীহরিপদ কানুনগো বহন করেছিলেন। তিনি লোকাদার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি (শ্রীহরিপদ কানুনগো) মাস্টারদার দলেও ছিলেন। "লোকনাথ বল" সদল বলে—৺শশাঙ্ক চৌধুরী, শশধর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস (জুনিয়ার), অর্দ্ধেন্দু কানুনগো ও সাধনপ্রসাদ দত্ত প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে—তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৺সুরেন্দ্রমোহনের (মধুদার) বাড়িতে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন।

এই সংবাদ চট্টগ্রামে পৌঁছানোর কয়েকদিনের মধ্যে সেখানকার রেডিক্যাল পার্টির সব সভ্য ও সমর্থক লোকাদার অনুগামী হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন—এবং রেডিক্যাল পার্টির চট্টগ্রামের অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

ঐ সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা অনাস্থাপ্রস্তাব আনবেন জেনে ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেসীরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে ডাঃ রায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'ট্যাক্সি' পারমিট দিতে আরম্ভ করেন। ঐ ট্যাক্সি পারমিট লোকাদা; বিনোদ দত্তও পেয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়—অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। চারজনই তাঁর কাছে একসঙ্গে গিয়া

হাজির হলেন—কি করলে ভাল হয়, কি করলে তাঁরা সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা করতে পারেন জিজ্ঞাসা করেন—ডাঃ রায়।

অম্বিকাদা বললেন—"গণেশ ঘোষ ও আমি পার্টির হোল টাইম ওয়ার্কার" —আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই।' অনন্ত সিংহ বললেন—"আমি গোলাব সিংহের ছেলে, বাঁধা মাহিনায় আমার পোষাবে না।" লোকনাথ বল পুলিশ কমিশনার হওয়ার ইচ্ছা জানালেন—উত্তরে ডাঃ বিধানচন্দ্র বললেন— "তোমার জন্য উপযুক্ত একটি পদ আমি মনে মনে স্থির করেছি, সময় মত জানাবো"। কিছুদিন পর ডাঃ রায় কলিকাতা কর্পোরেশনে একটি 'দুর্নীতি দমন বিভাগ সৃষ্টি করেন—এবং লোকনাথ বলকে "এন্টিকরাপশন অফিসার' হিসাবে নিযুক্ত করেন।

লোকনাথ বল এন্টিকরাপশন অফিসার হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মচারীদের সাপ্তাহিক / মাসিক বেতন দেওয়ার দিন সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে থাকেন। দেখা যায় যতজন লোক সাপ্তাহিক বেতন বা মাসিক বেতন নিতে হাজির হত তার থেকে অনেক বেশি লোকের নামে পেমেন্ট হত, যার ফলে লোকনাথ বলের কাউন্সিলারদের সাথে বিরোধ ঘটে। কাউন্সিলারেরা দলবদ্ধ হয়ে ডাঃ রায়ের শরণাপন্ন হন এবং বিধানবাবুর নিকট লোকনাথ বলের বিরুদ্ধে—তাদের কাজে (কাউন্সিলারদের) বাধা দিচ্ছেন বলে—অভিযোগ করেন। কাউন্সিলারেরা আরও দাবী করেন যে লোকনাথ বলকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক্। লোকনাথ বল কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি-দমনে অগ্রসর হলে তাঁকে তদানীন্তন কাউন্সিলার ডাঃ কে. পি. ঘোষ, তদানীন্তন শ্রমিক নেতা শ্রীরথীন তালুকদার ও দুর্নীতি দমন বিভাগের তদানীন্তন পরিদর্শক শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করায়—লোকনাথ বলের কাজ সুগম ও সহজ হয়।

কিছুদিনের মধ্যে ডঃ রায় লোকনাথ বলকে অতিরিক্ত দায়িত্বপূর্ণ—ডেপুটি কমিশনার (২) করে দিলেন। অর্থাৎ একদিকে এন্টিকরাপশন অফিসার, অন্যদিকে ডেপুটি কমিশনার (২) দুপদেই কাজ করতে থাকেন। কাউন্সিলারদের ক্রমাগত অভিযোগের ফলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় লোকনাথ বলকে এন্টিকরাপশনের পদ থেকে সরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার (২) করে দিলেন। অন্য দিকে তাঁর পি. এ—ফকির সেনগুপ্তকে এন্টিকরাপশন অফিসার পদে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব দেন।

লোকনাথ বল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটি

গঠন করেন। অফিস ছিল তদানীন্তন কংগ্রেস অফিস—(মৌলালী, লেনিন সরণীতে)। সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা)। কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন—লোকনাথ বল ও বীণা ভৌমিক।

১৯৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারী ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম কলিকাতায় সূর্য সেনের (মাস্টারদার) ফাঁসির দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। কলেজ স্কোয়ারস্থ "বিদ্যাসাগর মূর্তির" পাশে। ঐ স্থানে বিরাট শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ করে—লোকনাথ বল ও তাঁহার সহকর্মীরা ইউনিফরম পরে শহীদদের উদ্দেশ্যে ঐ শহীদ বেদীকে রুট মার্চ সহ গার্ড অব্ অনার দেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের পৌরহিত্যে এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা বীর বিপ্লবী মাস্টারদার (সূর্য সেন) কর্মধারার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করে বক্তৃতা করেন। এইভাবেই লোকনাথ বল প্রতি বৎসর ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদার ফাঁসির দিন বিভিন্ন হলে অনুষ্ঠান করে এসেছিলেন।

কয়েক বৎসর পরেই লোকনাথ বল এই ধরনের সভা রদ করেন—কারণ সূর্য সেনের (মাস্টারদার) ফাঁসির দিবসে ঐ সভা হলে বিভিন্ন বক্তা ন্যায়নীতিহীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ঐ সুযোগের অপব্যবহার করতেন। লোকনাথ বল স্থির করেন সূর্য সেনের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র মাল্যদান অনুষ্ঠান করা হবে। শুধু ঐ দিনের সভাপতি সূর্য সেন সম্পর্কে ভাষণ রাখবেন। সেই ধারা এখনো "সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির" পক্ষে অব্যাহত আছে।

লোকনাথ বল তাঁর উপার্জিত অর্থের একটি অংশ 'বেসিক পে' সংসারের খরচের জন্য রাখতেন—ডি.-এর টাকা বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে ব্যয় করতেন। একদিন অনন্ত সিংহ লোকনাথ বলের নিকট টাকার জন্য যান। লোকাদা অনন্তদাকে বললেন—"বিশেষ টাকা আমার হাতে নাই, আমার ব্যাঙ্কের পাশ বই নিন এবং একটি Blank চেক্ সই করে দিলাম—আমার একাউণ্টে যে টাকা আছে—তার থেকে যত বেশি পাওয়া সম্ভব চেকে বসিয়ে তুলে নেবেন।" অনন্তদা ব্যাঙ্ক থেকে সেভাবে টাকা তুলে নিলেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁর অন্যতম সহকর্মী মণীন্দ্র মজুমদার লোকনাথ বলের নিকট গিয়ে ৫০০৲ (পাঁচশত টাকা) ধার চাইলেন। লোকাদা সরাসরি মণীন্দ্রবাবুকে বললেন—"আমার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নহে" মণীন্দ্রবাবু বিফল মনোরথ

হয়ে ফিরে সাধন দত্তের নিকট এসে উল্লিখিত বক্তব্য রাখেন। সাধন দত্ত পরের দিন শশধর চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে লোকাদার নিকট যান। মণীন্দ্রবাবুকেও বলা ছিল লোকাদার অফিস যেন দু'টার পরে যায়—কথামত মণীন্দ্রদাও উপস্থিত। লোকাদার সাথে কথা বলার সময় সাধন দত্ত মণীন্দ্রদাকে টাকা দেওয়ার কথা বললেন—লোকাদা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। "দেখ সাধন, শশধর, অনেকেই টাকা ধার নিয়েছে—দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ধারের টাকা আজ পর্যন্ত ফেরৎ পাওয়া যায়নি"। তবুও সাধন দত্ত, শশধর চক্রবর্তী লোকাদার নিকট—মণীন্দ্রদাকে টাকা দেওয়ার জন্য আবার অনুরোধ করে বললেন "যদি মণীন্দ্রদা ঐ টাকা শোধ না দেন বা অসমর্থ হন—আমরা দুজনেই মাসে মাসে টাকা দিয়ে আপনার ধার শোধ করে দেব।" মণীন্দ্রদা টাকা পান। এবং মাসে মাসে লোকাদাকে ৫০ টাকা করে শোধ দিতে আরম্ভ করেন। সম্যক টাকা শোধ হওয়ার পরে লোকাদা সাধন দত্তকে বলেছিলেন—"আমি জীবনে এই প্রথম টাকা ফেরৎ পেলাম।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে অনন্তদা লোকাদার মৃত্যুর পর লোকাদার কাছ থেকে নেওয়া সমস্ত টাকা—লোকাদার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমা বলের নিকট ফেরৎ দেন।

চট্টগ্রামে গৈরলা গ্রামে যে বাড়ীতে মাষ্টারদা ধরা পড়েছিলেন সে বাড়ীর আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা শ্রীমতী ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাস যখন আর্থিক কষ্ট পাচ্ছেন তখন তিনি কলিকাতায় এসে লোকনাথ বলের শরণাপন্ন হন। লোকাদা তাঁকে তাঁর (লোকাদার) মার সঙ্গে নিজ বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেন।

১৯৫২ সাল। বিধানসভার নির্বাচন। কলিকাতাস্থ বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে লোকনাথ বলকে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তাব আসে—লোকাদা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বললেন—"গণেশ ঘোষ আমার অন্যতম গুরু। আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবো না। আপনারা ঐ কেন্দ্র ভিন্ন, পশ্চিমবঙ্গের অন্য যে কোন আসনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালে আমি প্রস্তুত।" তদানীন্তন কংগ্রেসীরা তাঁকে অন্য কোথাও দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়ে—নানা জায়গায় নির্বাচনী সভায় কংগ্রেসের হয়ে বক্তৃতা করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

লোকনাথ বল সূর্য সেন স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে একটি চট্টগ্রাম বিপ্লবের একটি ইতিহাস তৈরী করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সতীভূষণ সেনের পৌরহিত্যে এক সভা হয়েছিল। ঐ সভায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত

সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।—সকলেই ইতিহাস রচনার পক্ষে মত দেন। সভাপতি সতীভূষণ সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—"আপনারা সকলে নিজ নিজ লেখা যদি আমার নিকট পাঠান, তবে আমি ঐ লেখাগুলি অধ্যাপক ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো (প্রাক্তন ইতিহাসের অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদানীন্তন ইতিহাসের অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে একটা ইতিহাস তৈরী করার ব্যবস্থা অবশ্যই নেব। সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকাদা উঠে বলেন "কোন ঐতিহাসিককে দিয়া ইতিহাস লেখান আমাদের ইচ্ছা নাই। আমি তাহাতে নাই।" অম্বিকাদা সভাস্থল ত্যাগ করলে—তাঁর পিছু পিছু গণেশদা অনন্তদা চলে গেলেন। এখানেই এই প্রচেষ্টার ইতি।

লোকনাথ বলের নেতৃত্বে "সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির" প্রচেষ্টায় কলিকাতাস্থ মির্জাপুর স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে সূর্য সেন স্ট্রীট করা হয়। মাষ্টারদা কলিকাতা আসলেই—মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকতেন—তাঁর সেই স্মৃতিরক্ষার জন্যই এই নূতন নামকরণ। লোকনাথ বলের ঐকান্তিক ইচ্ছা মাষ্টারদার একটা আবক্ষ মর্মর মূর্তি কলেজ স্কোয়ারে স্থাপন করা। তাঁর ঐ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে সূর্য সেনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। ঐ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন বাঘা যতীনের সহকর্মী বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার। ঐ মূর্তিতে মাল্যদান করতে গণেশ ঘোষ উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সি. পি. আই-এর পক্ষে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে ছিলেন। লোকনাথ বল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন এ সঠিকভাবে যেমন কাজ করে আসছিলেন, তেমনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন।

মৃত্যুর দিনেও বিকেল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করে—কর্মান্তে তিনি বাড়ী ফেরার পথে গাড়ীতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ড্রাইভারকে বলেন—"গাড়ী জোরে চালাও। আমি আমার ছেলে-মেয়েকে দেখতে চাই। তারপরে তুমি আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবে।" ড্রাইভার সঠিকভাবে গাড়ী চালিয়ে লোকাদাকে নিয়ে বাড়ীর দরজায় গিয়ে পোঁছান। লোকাদা ড্রাইভারকে বলেন—ছেলে-মেয়েকে ডাক, আমি তাদের দেখবো"—দেখা সাক্ষাতের পর ড্রাইভারকে আদেশ দেন—"যত তাড়াতাড়ি পার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে চল।"

গাড়ী মহাত্মা গান্ধী রোড/চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হওয়ার পর মুহূর্তেই "লোকনাথ বল" শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গাড়ী যখন মেডিক্যাল কলেজে

ঢোকে গাড়ীর চালক ডাক্তারদের ডাকাডাকি করে তখন অন্যান্য লোক এসে ধরাধরি করে লোকাদাকে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে মেঝের উপরই শায়িত করে রাখেন। দুই নাক দিয়ে অজস্র রক্তপাত হচ্ছিল—ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বলে উঠলেন, "বিপ্লবী বীর লোকনাথ বল ইজ নো মোর"। সাধন দত্তের কাছে খবর পাঠানো হলো—সাধন দত্ত এসেই বীর বিপ্লবীর পাশে সারা রাত বসে—পোষ্ট মর্টম যাতে করতে না হয় তার চেষ্টা করতে লাগলেন। সাধারণ নিয়মে পথে মৃত্যু হলে পোষ্টমর্টেম হওয়াই আইন। এই ক্ষেত্রে যাতে পোষ্টমর্টম করতে না হয় তার জন্য সাধন দত্ত লোকনাথ বলের সহযোদ্ধা বিপ্লবী ফকির সেনকে বলেন—"তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে—জোড়াসাঁকো থানা লোকাদার মৃতদেহ মর্গে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন—ফকির সেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে—পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ পাঠান লোকনাথ বলের মৃতদেহ পোটমর্টম হবে না—জোড়াসাঁকো থানাকে বল মৃতদেহ ছেড়ে দিতে। পুলিশ অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবের হাতে মৃতদেহ তুলে দেয়। এক বিরাট শোভাযাত্রা করে মেডিক্যাল কলেজ থেকে নিমতলা শ্মশানে লোকনাথ বলের মরদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়। তাঁর স্ত্রী, পুত্র কন্যা আত্মীয়-স্বজন অগণিত বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর আত্মার সংগতি কামনা করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বিদায় নেয়। এ প্রসঙ্গে বারবার মনে পড়ে রবীন্দ্র-নাথের সেই অবিস্মরণীয় বাণী "এই সেই মুহূর্ত যার পদতলে এ ধুলিতে রেখেছি সর্বশেষ প্রণতি। মায়ার চক্রজালে বিস্ময়ে বিমূঢ়, আমরা সর্বজন আজ ভাতৃহীন, পিতৃহীন। শেষ নমস্কারে অবনত।

লেখক সর্বশ্রী ১। ননী সেন
২। ডাঃ কে. পি. ঘোষ
৩। রথীন তালুকদার
৪। নির্মল কুণ্ডু
৫। শশধর চক্রবর্তী
৬। অর্দ্ধেন্দু কানুনগো
৭। সাধন দত্ত।

চট্টগ্রাম বিপ্লবে বল পরিবারের পাঁচজন সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন—

(১) লোকনাথ বল।

(২) সুবোধ বল।

(৩) নিকুঞ্জ বল।

(৪) প্রভাস বল।

(৫) হরিগোপাল বল (টেগরা)।

প্রভাস বল ও টেগরা বল জালালাবাদ যুদ্ধে শহিদ হন। যতদূর জানা আছে, একটি বংশের পাঁচজন বিপ্লবী একসাথে অবিভক্ত ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

ফিরে দেখা

শৈলেশ রায়

পরিবেশ :—

আমার জেঠতুতো ভাই শ্রীমধুসূদন রায় অনুশীলন পার্টির সভ্য ছিলেন। উনি দিনে ও রাত্রে অসময়ে আসিতেন। আমার বাবা অভিভাবক হিসাবে তাঁহাকে অত্যধিক মারধোর করিতেন, উনি নীরবে উহা সহ্য করিয়া যাইতেন। একটা কথাও বলিতেন না। ওনার টাইফয়েড হয় এবং মারা যান, অসুস্থ অবস্থায় অনুশীলন পার্টির অগণিত সদস্য তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। উহাতে বাবার অনুতাপ হইতে লাগিল, বাবা মনে মনে ভাবিলেন আমি কাহাকে এত মারধোর করিয়াছি? আমার সেজদাও অনুশীলন পার্টির সভ্য ছিলেন।

কুমিল্লায় আমাদের বাসায় বাবার মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। সোনাদা (মধুসূদনভাই) ৺দুর্গাকুমার রায় আমাদের পরিবারের ছয় জনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন — পরে কর্মস্থলে কলিকাতায় আসেন।

কলকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলে (১৯২১) ভর্তি হই। এরপর অনিবার্য কারণে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কুমিল্লায় চলিয়া আসিতে হয়।

আমার জীবনের প্রথম স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা জাগে যখন আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। মুকুন্দদাসের স্বদেশপ্রেমের গানে অভিভূত হই। অবশ্য বাড়ির বাধা ছিল এই গান শোনার বিষয়ে।

এরপর ১৯২৪ সালে আবার কলিকাতায় আসি। কলকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস VI-এর ছাত্র। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভুবন ধর লেনের বাসায় থাকি। এরপর ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি দেশাত্মবোধক গানের বই পাই।

এর একটি গানের প্রথম লাইন

'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়'।

তারপর আবার কুমিল্লার ঈশান পাঠশালায় ভর্তি হই ক্লাশ VII-এ। আমি ঐ সময়ে মনোযোগ সহকারে যত পড়াশুনা করেছি, কলেজেও তা করিনি। অষ্টম শ্রেণীতে চট্টগ্রামের দুর্গাপুর হাইস্কুলে ভর্তি হই। দুর্গাপুর স্কুলে খদ্দর পরিয়া আসিতে হইত, এই নিয়ম ছিল। আমি এখনও সেই অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই।

সেখানে উঁচু ক্লাশের দাদা হরলাল চৌধুরী আমাকে দেশসেবার কাজে প্রথম দীক্ষা দেন। আমি সেই বয়সেই দেশ বিদেশের মুক্তি সংগ্রামের বহু বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়িতাম।

তখন চট্টগ্রামের মধুদা নামে একজন আমাদের সহিত কথা বলিতে আসিতেন। তিনি আমাদের দুর্গাপুরের সংলগ্ন পাহাড়ে লইয়া গিয়া আলাপ করিতেন। মধুদা (মধুসূদন দত্ত) জালালাবাদ পাহাড়ের শহীদদের মধ্যে একজন ছিলেন।

চরিত্র গঠন ঃ

আমি দুর্গাপুর স্কুলে থাকাকালীন প্রত্যহ সকালে ৪টায় শয্যা ত্যাগ করিতাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পরে ব্যায়াম করিতাম। কি শীত কি গ্রীষ্ম স্নান সারিয়া প্রার্থনা ঘরে ঘণ্টা বাজাইতাম। পরে একা গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিতাম। সঙ্গী ছাত্ররা বলিত শৈলেশটার জন্য শীতকালের চিনি ঘুম ঘুমাইতে পারিলাম না।

আমি ব্রহ্মচার্য বই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পরবর্তী জীবনে তাহা অনেক কাজে লাগিয়াছিল।

দুর্গাপুর স্কুলে প্রথম দিনের ঘটনা। আমি বয়সে ও আকারে সবচেয়ে ছোট ছিলাম। বানিশবাবু আমাদের ক্লাশ টিচার ছিলেন। তিনি ক্লাশে ঢুকিতেই ছেলেরা দাঁড়াইয়া উঠিল, আমি পিছনের সীটে ছিলাম। টুলটা সরাইয়া নিলাম। বসিতে গিয়া ছেলেরা হুড়মুড় করিয়া পড়িল। বানিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কি ? কি ? ছেলেরা বলিল, কিছু না, কিছু না। আমি বানিশবাবুর বেত হইতে রক্ষা পাইলাম। ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, কি দুষ্টু ছেলেরে। দুর্গাপুর স্কুলে পরীক্ষার ফল ভালো হইত। গান, কবিতা, আবৃত্তি, থিয়েটার-ও খেলাধুলার চর্চা ছিল। আমি কবিতা আবৃত্তিতে সর্বদা দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতাম।

গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া গেল, আমি পিসতুতো ভাইয়ের (মহেন্দ্র ঘোষ) বাড়িতে বেড়াইতে গেলাম। তিনি আমাদের খেলাধুলার শিক্ষক ছিলেন। একদিন কথার ছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদা গাই আর বলদের তফাৎ কি? তাহাতে তিনি বুঝিয়া নিলেন আমার সম্পর্ক জ্ঞান মোটেই নাই। তিনি আমাকে কিভাবে ফুল হইতে ফল হয়, কীভাবে মানুষের জন্ম হয় ইত্যাদি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সৃষ্টি রহস্য বিষয়ে আলোকপাত করিলেন। আমার জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া গেল। ইভ ও আদমের মতন আমি জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইলাম। আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। এতদূর অবনতি হইল যে, আমাকে কক্স বাজার সমুদ্রের পাড়ে যাইতে হইল। কোনও দিন সমুদ্র দেখি নাই। দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অমনি হাঁটু গাড়িয়া ভগবত ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

আমরা হোষ্টেলে থাকি। তখন দুর্গাপুর স্কুলে কৃষিকার্যের চর্চা হইত। আমরা ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি ইত্যাদির চারা হইতে আরম্ভ করিয়া গাছ লাগানো পর্যন্ত শিক্ষা করিতাম। এই হাল চাষ পরবর্তী জীবনে আমার অনেক কাজে লাগিয়াছে।

দুর্গাপুর স্কুলে আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটা Poor fund করিয়াছিলাম। তাহাতে লোকের মাঠের পাকা ধান কাটিয়া আমরা মাথায় নিয়া বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতাম। গৃহস্থের সহিত চুক্তির টাকা ফাণ্ডে জমা দিতাম।

এই সকল কাজ দেখিয়া হেড মাষ্টার (নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত) মহাশয় আমাদের বোর্ডিংয়ে যে কয়জন ছিলাম তাহাদের এক টুকরা জমি দিয়াছিলেন। তাহাতে ফসল ফলাইয়া আমরা মাথায় করিয়া বাজারে নিয়া বিক্রয় করিতাম।

সে পয়সা ফাণ্ডে জমা রাখিতাম।

হেড মাষ্টার মহাশয় বেতন নিতেন না ও সরকারী সাহায্যও নিতেন না। আমাকে সব মাষ্টাররা ভালোবাসিতেন, কারণ আমি প্রত্যেক বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলাম—কি গানে, কি কবিতা আবৃত্তিতে। ইহার জন্য অন্যান্য ছাত্ররা আমাকে হিংসা করিত।

আমাদের হেড মাষ্টার মহাশয় নোটিশ দিয়াছেন এইবার পরীক্ষায় নকল ধরা পড়িলে তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হইবে না। আমাদের VIII-এ শেষ পরীক্ষা চলিতেছিল। সামনের জনের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। আমি সংস্কৃতের একটা Translation পারি নাই। সামনের জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। উনি তাহা অঙ্কের

খাতায় লিখিয়া দিলেন। আমাদের স্কুলের একজন বৈষ্ণব শিক্ষক ছিলেন। লেংড়া ছিলেন তিনি। আমাদের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন। তিনি অংকের খাতায় সংস্কৃত দেখিয়া নকল করিয়াছি বলিয়া আমার নামে হেড মাষ্টারের কাছে রিপোর্ট করিলেন। এই ঘটনা প্রকাশ হইয়া গেল। স্কুলে গেলে হেড মাষ্টার মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গেলাম। মনে করিলাম বেত মারিয়া আমাকে লাশ করিয়া দেওয়া হইবে। গিয়া দাঁড়াইতেই হেড মাষ্টার ধীরে ধীরে বলিলেন তোমরা স্কুলের গৌরব। তোমরা যদি নকল করিয়া ধরা পড় তাহা হইল স্কুলের বদনাম। তাহা কি তোমরা চাও? আমি বলিলাম, না স্যার আপনাকে কথা দিতেছি আর জীবনে নকল করিব না। কথা রাখিয়াছিলাম। প্রমোশন পাইয়া ক্লাশ IX-এ উঠিলাম। অকৃতদার বৈষ্ণব মোহন্ত হইয়া চলিয়া যাইবেন। সেই উপলক্ষে বিদায় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে হেড মাষ্টার মহাশয়-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়ে এই তিন মাস কাটাব? মাষ্টার মহাশয় বললেন যে কুমিল্লা অভয় আশ্রমে গিয়ে থাক। সেখানে থাকলে তোমার পক্ষে খুব ভাল হবে। তাঁর কথা মতো আমি অভয় আশ্রমে চলে গেলাম। তারা খদ্দর পরিহিত দেখে আমাকে লুফে নিলেন। তখন সেখানে নৃপেন ডাক্তার, প্রফুল্ল ঘোষ, অন্নদাবাবু ও আরো অনেক নেতারা ছিলেন। আমি কুমিল্লা শহরে মুষ্টি ভিক্ষা তুলতাম প্রতি রবি-বারে। অভয় আশ্রমের খদ্দরের দোকান চৌমুনিতে ছিল। এর মধ্যে আমি ম্যাট্রিক পাশের খবর পেলাম।

প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। সবাই আমাকে বলল যে তুমি আমাদের এখানে থেকে যাও। কিন্তু তাদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও রাজি হলাম না।

ডাক্তার হওয়ার সুযোগ পেয়েও পেলাম না। আমি চট্টগ্রাম গেলাম. তখন নোয়াখালি জেলায় ফার্ষ্ট ডিভিসনের Candidate ছিল না। আমিই একমাত্র ছিলাম। অধিকন্তু নোয়াখালি District Board-এর একটা স্কলারসিপও ছিল। আমি মনে করলাম L.M.F. হব না। আমার দাদা M.B.B.S., I.S.C.। পাশ করে M. B. B. S হব। কুমিল্লা ভিক্টরিয়া কলেজে I. S. C-তে ভর্তি হলাম।

মাষ্টারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ :—

১৯২৯ সালে মাষ্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। যখন তিনি আহত

অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন তখন যুগান্তর দল সুভাষ বসুকে এবং অনুশীলন দল J. M. সেনগুপ্তকে সমর্থন করতেন। হঠাৎ দুই পাটিতে মারামারি হয়। এই সময় মাষ্টারদা ও সুখেন্দু দত্ত আহত হন। শত চেষ্টা করেও শেষোক্ত জনকে বাঁচান গেল না। তখন থেকে মাষ্টারদা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। আমাকে নিয়ে পাশে বসিয়ে রাখতেন। আমি সকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে (হাসপাতালে) বসে থাকতাম। এই অবস্থায় আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে চরম অত্যাচারের মধ্যেও মনকে ঠিক রাখা যায় কিভাবে? মাষ্টারদা বললেন "মনের মধ্যে জেদ আনিবে ও ভাবিবে আমি তো কিছু জানি না"। আমি তারপর কুমিল্লা চলে গেলাম। মানুষের মনকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারিলে সবকিছু সম্ভব—একাধিকবার আমি তাহার প্রমাণ পেয়েছি। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন মাস্টারদা হলেন ভোট মাধ্যমে। আমার বয়স তখন ১৮।১৯ বৎসর। মোহিতদাদের কুমিল্লা চৌমিনানিতে একটা খদ্দরের দোকান ছিল। মোহিতদাকে বলিলাম আমাকে একটা লজিং ঠিক করে দিন। মোহিতদা তালপুকুর পাড়ে ভূতপূর্ব প্রফেসার দেবেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসা ঠিক করিয়া দেন। শান্তি ঘোষের (কুমিল্লার ডি. এম. Stivence হত্যাকারী) ছোট ভাই বোনকে পড়াইতে হইবে। শান্তি সুধা ঘোষের বিধবা মা ও ভাই তাস খেলবার সময় আমাকে ডাকিতেন। শান্তি সুধা ঘোষ কিশোরী ছিলেন। আমি ১৮।১৯ বৎসরের যুবক। আমার লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন চলিবার পরে আমি মোহিতদাকে বলিলাম, অন্য লজিং ঠিক করে দিন। তিনি বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। একটি ছাত্রকে পড়াইতে হইবে।

এইদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্রস্তুতি পুরোদমে চলিতেছে। তখন আসগর খাঁর দীঘির পশ্চিম পাড়ে জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটা কংগ্রেস অফিস ছিল। সেখানে মাষ্টারদা সূর্য সেন বসিয়া থাকিতেন।

পরীক্ষায় ফেল করিলাম। মাষ্টারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাঙ্গা কি করিবে? আমি বলিলাম আপনারা যা করিতে বলিবেন তাহা করিব। অস্ত্রাগার আক্রমণের ২ ঘণ্টা আগে একটা কাগজের Bundle মাষ্টারদা আমাকে দিলেন। ইহা লইয়া হরলালদার গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছালাম। মাস্টারদা বলিয়া ছিলেন ১৯শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন না খুলি। এই দিনে ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল হইয়া গেল। পরের দিন পাহাড় ডিঙাইয়া কুমিল্লার পথে রওনা

হইলাম। বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম Indian Republican Army চট্টগ্রাম শাখার প্রচারপত্র। বিভিন্ন স্থানে গোপনে পাঠালাম।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল হয়ে গেল (১৯৩০ সাল ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার গুড-ফ্রাইডের দিন)।

মাষ্টারদারা গ্রামে লুকিয়ে আছেন। মাছ যেমন জলে থাকে তেমনি। তারপর সরোজ গুহ ও বিনোদ দত্ত আমার গ্রামের বাড়িতে গেলেন। (নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার কর পাড়া গ্রামে) নোয়াখালি জেলার যুগান্তর পার্টির সাহায্য নিলাম। সেই হিসাবে বিভিন্ন গ্রামে পলাতক আসামীদের আশ্রয় দিতে রাজি হলাম। তাদের টাকা ফুরিয়ে গেল। আমি আবার টাকা আনবার জন্য ধলঘাট দিনেশের বাড়ির সামনে শিবমন্দিরে রাত্রে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করলাম। নির্মলদাও সঙ্গে ছিলেন। ওনাদের কাছে টাকা ফুরাইয়া যাবার কথা বলিলাম। নির্মলদা বলিলেন এত সকালে টাকা ফুরাইয়া গেল! মাষ্টারদা নির্মলদাকে বলিলেন "ওদের কদিন পরে ফাঁসি হবে যদি ধরা পড়ে। তাই যা চায় দিয়ে দিন।

তখন গ্রীষ্মকালের ছুটি। আমি কুমিল্লা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শশী-ভূষণ বাবুর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতাম। ছুটিতে সিমলা বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হলাম। সিমলা যাবার কয়েকদিন আগে মাষ্টারদার ডাক এলো। আমি তখন সিমলা যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে চট্টগ্রামে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি কুমিল্লার জেলাশাসক ষ্টিভেন্স-এর উপর নজর রেখে কখন কোথায় যান ২০ ঘণ্টায় রিপোর্ট দেবার জন্য বললেন। সেই কথামত আমি রিপোর্ট সংগ্রহ করে তাঁর কাছে গেলাম।

সেই সময় যুগান্তর পার্টি বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। রিপোর্ট পেয়ে মাষ্টারদা খুশী হয়ে চট্টগ্রামে পার্টির সরোজ গুহ এবং বিনোদ দত্তকে কুমিল্লায় পাঠালেন ডি. এম ষ্টিভেন্সকে হত্যা করতে। অন্যদিকে কুমিল্লা যুগান্তর পার্টির নায়ক অখিল নন্দী শান্তিসুধা ঘোষ এবং সুনীতা চৌধুরীকে দিয়ে D. M. ষ্টিভেন্সকে হত্যা করান।

পরে সরোজ গুহ (চট্টগ্রাম)ও কুমিল্লার যুগান্তরের সভ্য নরেন ভৌমিক উভয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে এক মদের দোকানের সামনে ঢাকার ডুর্নো সাহেবকে গুলি করেন। ডুর্নোর এক চোখ অন্ধ হয়।

আমি মাষ্টারদাকে বলেছিলাম,—"মাষ্টারদা ষ্টিভেন্স খুবই পপুলার, ওকে হত্যা করবেন না, তার বদলে গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান এলিসনকে হত্যা করা হোক। উনি খুব অত্যাচারী"। মাষ্টারদা সেটা শুনে বললেন "I C S are the Pillers of British imperialism. If we can crush those Pillers, building of imperialism will automatically collapse. অর্থাৎ আই-সি-এসরা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ স্বরূপ। যদি আমরা স্তম্ভগুলি গুঁড়িয়ে দিতে পারি তবে সাম্রাজ্যবাদের অট্টালিকা আপনা থেকেই ধ্বসে পড়বে। আমি আর কিছু যুক্তি দিতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম—যেহেতু Army raid-এর পর রিভলবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে সেহেতু মাষ্টারদার কাছে রিভলবার চাওয়া সঙ্গত হবে না। নিজে যদি কোন রকমে একটা রিভলবার সংগ্রহ করতে পারি তাহলে আমিই এলিসনকে হত্যা করবো।

অনন্ত সিংহ আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পনীর ১৭ হাজার টাকা লুঠ করার পর পার্টিতে একটা প্রস্তাব করেন যে, আর সরকারী টাকা কিংবা ধনীর বাড়ি থেকে টাকা লুঠ করা ঠিক হবে না। এতে মোকদ্দমায় সব টাকা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে টাকা চুরি করে অথবা আপোষে সংগ্রহ করতে হবে। তাহলে আর মোকদ্দমার ভয় থাকবে না।

সেই প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের নোয়াখালি জেলার করপাড়া চৌধুরী বাড়ির (নিজ বাড়ির) এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নের গলার সোনার হার চুরি করে নিই। আমি যে চুরি করতে পারি সে ধারণা কারোর মনেই স্থান পায়নি। সেই হার বিক্রি করে ১৫০ টাকা পাই, টাকাতো যোগাড় হল—এখন রিভলবার পাই কোথায়? আমার এক সহপাঠী বলল-বার্মা দেশে আমরা বাঙ্গালীরা একটা রিভলবার জোগাড় করেছিলাম। সেটা এখন রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর গ্রামের বীরেশ গুপ্তের কাছে আছে। তা পাওয়া যেতে পারে। তখন আমি বীরেশ গুপ্তের কাছ থেকে রিভলবারটি সংগ্রহ করলাম। আমি সর্বদা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিগ্রহণের রিভলবার ব্যবহার করেছি। সেগুলি ৪-৪৫ বোরের। এখন যেটা সংগ্রহ করলাম সেটা ৩-২০ বোরের। এটা দিয়ে মানুষ মারা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলাম। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল—এটা দিয়ে মানুষ কেন বাঘও মারা যাবে। তারপর কার্তুজ অল্প, তারা বলল, কলকাতায় কার্তুজ আছে, অমুক জায়গায় গেলেই পাবেন।" সেখান থেকে কার্তুজ সংগ্রহ হল।

কার্তুজ আনার পর বাড়ি হয়ে কুমিল্লা গেলাম। কুমিল্লা গিয়ে আমার কাজ (এলিসনকে ওয়াচ করা) আরম্ভ করলাম। ভাবলাম, রিভলবার নিয়ে এলিসন সাহেবের সামনে দিয়ে তো কোন দিন যাইনি। সেটা যাওয়া দরকার, কারণ নার্ভ কি রকম থাকে সেটা পরীক্ষা করা দরকার। তার সামনে দিয়ে রিভলবার নিয়ে গেলাম। দেখলাম নার্ভাস হইনি। ঠিকই আছি। আবার অনন্ত সিংহ এটাও বলেছিলেন, "কোন Action-এ যাওয়ার আগে কার্তুজ ঠিক আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে নেবে।" সেই অনুযায়ী হরলালদাকে (যিনি আমাকে দলে যুক্ত করেছিলেন) নিয়ে রেল লাইনের পাড়ে রিভলবার টেষ্ট করলাম।

তারপর, ২৯শে জুলাই ১৯৩২ সালে খেয়ে দেয়ে বের হচ্ছি। আমার ছোটভাই সীতেশ রায় বলল "আমি যাই দাদা।" আমি বললাম, ছোটভাই মায়ের, বড়ভাই বাবার, আমি মেজভাই দেশের, সুতরাং আমাকেই দেশের কাজে সাজে। মাকে বলিস (মা তখন বার্মা দেশে) আমি দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে বলি দিতে যাচ্ছি।"

ষ্টেডিয়ামের উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে এলিসন সাইকেলে আসছিলেন (তখনও ষ্টেডিয়াম তৈরী হয়নি)। বর্ষাকাল, তাই ছাতার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ সেই ছাতার ভিতর থেকে রিভলবার বের করে সাইকেল আরোহী এলিসনকে গুলি করলাম। উনি তিনটি গুলি খেয়ে ড্রেনে পড়ে গেলেন। তখন আরও দুটো গুলি ড্রেনেই তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। পাঁচটা গুলিই শেষ হয়ে গেল। তখন রিভলবার খালি। আমার আর কার্তুজ ভরারও সময় নেই! আত্মহত্যা করাটা আমি ভীরুতা মনে করি। তাই দৌড়তে আরম্ভ করলাম। এলিসনের দেহরক্ষীও আমার পেছনে ধর ধর বলে কিছু দূর ধাওয়া করলো। আর গেল না। এলিসনের দেহরক্ষী গুলি ছুঁড়তে পাবে এই আশংকায় আঁকাবাঁকা (zigzag) পথে দৌড়ালাম। দৌড়াচ্ছি এমন সময় একটা ধোপা আমাকে ধরতে পারত, তাকে ফাঁকা রিভলবার দেখাতেই সে সরে গেল। ছোট্ট একটা মাঠ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি এমন সময় রাস্তার নিকট কতগুলি লোক জড়ো হচ্ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করল 'কী'? আমি বাঁ হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বললাম—'আগুন আগুন'। ডান হাতে ফাঁকা রিভলবার লুকানো ছিল। ইচ্ছা করলে আমাকে ধরতে পারত। পথ ছেড়ে দিল। থানার খুব কাছে একটা গলির মধ্যে গিয়ে রিভলবার Re-load করলাম। বহু রাস্তা ঘুরে বাসায় গিয়ে উঠলাম। বাসায় পৌঁছে দেখি হাতে গুলির চিহ্ন,

রক্ত ঝরছে। Action-এর সময় বুঝতে পারিনি, এলিসন বা তার দেহরক্ষীর গুলি আমার হাতে লেগেছে। বাসায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছিল, ক্ষত-চিহ্নে লাগালাম, তারপর পরণের জামা কাপড়গুলি ইটের সাথে বেঁধে পুকুরে ফেলে দিলাম, কিছুক্ষণ পরে স্নান করে বৈঠকখানায় গিয়ে শুনলাম এলিসনকে গুলি করা হয়েছে। খুব অত্যাচারী ছিল, বেশ হয়েছে।

যে স্থানে এলিসনকে গুলি করা হয়েছিল ঠিক তার দক্ষিণে মাঠে একটি ভালো ফুটবল খেলা ছিল—স্নান সেরে সেই মাঠে খেলা দেখতে গেলাম। এক সপ্তাহ বাসাতেই ছিলাম। তারপর সেখান থেকে দুর্গাপুর হয়ে মাস্টারদাব সাথে দেখা করতে গেলাম। যাওয়ার পথে এক জায়গায় নৌকায় ওঠার সময় আমার সঙ্গী বলল যে 'আপনি তো চিটাগাঙের ভাষা বলতে পারেন না, বোবা হয়ে থাকলে, আমি আপনার কথা লুফে নিয়ে উত্তর দেব।'

মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করলাম। মাস্টারদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে অভিনন্দন জানালেন।

আমি যে এলিসনের হত্যাকারী বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হাজার চেষ্টা করেও সেকথা জানতে পারেনি।

মাস্টারদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ইণ্ডিয়ান বৈপ্লবিক আর্মির দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট হন তারকেশ্বর দস্তিদার—তাঁরই নির্দেশে মাস্টারদাকে জেলখানা থেকে বের কবার দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার উপর—দুর্ভাগ্যবশতঃ জেলের বাইরে লালদিঘির পাড়ে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে আমার নিকট হতে একটি গোপন চিঠি এবং গৃহ হতে পায় একটি রিভলবার—বিচারে ৭ বৎসর কারাদণ্ড—আমাকে আন্দামানে পাঠান হয়।

একটি অবিস্মরণীয় সাক্ষাতকার

অরুণকুমার দস্তিদার

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ ইং রাত ১০টায় যুব বিদ্রোহ শুরু হল। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ১২ জন বিপ্লবী তরুণ যুদ্ধে আত্মাহুতি দিল। জীবিত বা আহত যাঁরা ছিলেন, মাষ্টারদার নির্দেশে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন। এমনিই একটি আশ্রয়ে ১৯৩১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষান্তে আমার ডাক এল। আমার বাস শহরে। যেতে হল গ্রামে। নির্দিষ্ট জায়গায় একজনের ডান কব্জিতে চিহ্ন দেখে তার পিছে পিছে ছুটে চললাম রাতের অন্ধকারে। পরিচয়হীন শব্দবিহীন চলছি এঁকে বেঁকে আপন মনে। নদী পার হয়ে আবার চললাম। এইভাবে বহুদূর যাবার পর একটা বাঁশ ঝোপের আড়ালে আর একজন দাঁড়িয়ে। এবার চললাম নিঃশব্দে অন্য এক অজানার সাথে। একটি জরাজীর্ণ বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দেখি যুব বিদ্রোহীরা কয়েকজন বসে। সকলেই আমার পরিচিত। এর মধ্যে ছিলেন শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, সরোজ গুহ, মহেন্দ্র চৌধুরী ও আশ্রয়দাতা বিনয় সেন প্রমুখেরা। দুঃখের লেশ নেই। হাসি ফেটে পড়ছে সকলের মুখে! রাত তখন ১টা। বড় একটি আধারে এল খিচুড়ী। একই পাত্রে সকলে হাত দিয়ে খেলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাক এল পাশের অতি ছোট এক ঘরে। ঢুকে দেখি মাষ্টারদা একা বসে। পাশে গীতা ও ছোট একটি পিস্তল। প্রশান্ত চেহারা! মনে হল দেহ থেকে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। সামনেই বসলাম, মৃদু স্বরে কথাবার্ত্তা হল, পরিশেষে ওনার কাছে কাজ করার প্রার্থনা জানালাম। উনি শুনলেন; ধীর স্থির ভাবে আমাকে বললেন, দেখ, আমাদের পরে তোমরা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চলবে সংগ্রাম। তোমরা আমার ভরসা। এই বলে তিনি আমার মাথায় হাত দিলেন। আমি ওনার পদধূলি নিলাম। ইহাই আমার শেষ সাক্ষাত। এর থেকেই বুঝুন মাষ্টারদায় সঙ্গে দেখা হওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলাম। অত্যাচারী আসানুল্লা হত্যায় ধরা পড়লাম।

চট্টগ্রাম জেল, প্রেসিডেন্সি জেল হয়ে হিজলি জেলে চলে গেলাম। ঐখানেই বন্দী থাকাকালীন ১৯৩৪ ইং ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির খবর পাই। ওনার শেষ কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

চট্টগ্রাম বিপ্লবে সুভাষ, শরৎ ও জে, এম, সেনগুপ্তর অবদান

শীলা মুখোপাধ্যায়

১৯২১ সালে আই সি এস পাশ করার পর সিভিল সার্ভিসের চাকরি হেলায় প্রত্যাখ্যান করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পডলেন সুভাষচন্দ্র।

বিলাত থেকে বোম্বাইতে পৌঁছে প্রথমেই দেখা করলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। অনেক কথা হ'ল, কিন্তু মন ভরল না সুভাষের।

গান্ধীজির অহিংস নীতির দ্বারা ইংরেজদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং তার ফলে আসবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা একথা সুভাষচন্দ্র কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না। এবং কাউকে বিশ্বাস করতেও বলতেন না।

বোম্বে থেকে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। হল হার্দিক আলোচনা। অন্তর বলল, এই তো আমার নেতা।

চিত্তরঞ্জন বুঝলেন দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ এমনই একটি তরুণের জন্য তিনি বুঝি এতদিন অতন্দ্র প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন। শুরু হল বিরাট কর্মকাণ্ড। সুভাষ হলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত।

১৯২৪ সাল। কলকাতা পুলিশের বড়সাহেব টেগার্ট। নিষ্ঠুর অত্যাচারী। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্থির করলেন দেশের এই দুশমনকে খতম করবেন। দিনের পর দিন ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগলেন শয়তানকে দূর থেকে সংগোপনে।

১২ জানুয়ারি এক কুয়াশা ঘেরা শীতের সকালে চৌরঙ্গীর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে, সুবর্ণ সুযোগ মিলল। দ্রাম, দ্রাম, দ্রাম। ছুটল গুলি। সাহেবের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আশেপাশে সোরগোল। গোপী পড়লেন ধরা, তাঁকে ঘিরে শুরু হল বিচারের প্রহসন। এইসময় তিনি জানতে পারেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। ঘন কুয়াশায় ঠিক-মত বুঝতে না পেরে হত্যা করেছেন অন্য এক নিরীহ পথচারী সাহেবকে। এই অঘটনের জন্য তিনি হয়েছিলেন মর্মাহত।

১৯২৪ সালের ১ মার্চ ফাঁসী হয়ে গেল গোপীর। তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেম ও সাহসের প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। বিপ্লবীদের প্রকাশ্যে প্রশংসা এই প্রথম।

সেই বছরেই দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে গান্ধীজির চাপে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন সংযোগ আছে এই সন্দেহে ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনে সুভাষকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম দু মাস আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তারপর কিছুদিন বহরমপুর জেলে অবশেষে একেবারে ব্রহ্মদেশে সুদূর মান্দালয় জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে বন্দি জীবন যাপন করেন। এই সব রাজবন্দি ছিলেন যুগান্তর দলের, সূর্যসেনের চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এইভাবে দীর্ঘ দুটি বছর কাটল কারান্তরালে।

১৯২৭ সালের ১৬ মে সুভাষ মুক্তি পান।

তাঁর ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড দেশবন্ধুর গৌরবময় জীবনের অবসান হয়েছে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাস। সে বছর কলকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জি. ও. সি ছিলেন সুভাষ। এই সম্পর্কে বিপ্লবী ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক কায়দায় গড়া। পূর্ণ দাস, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন, হরিদা, প্রতুল গাঙ্গুলী এবং অরুণ গুহ, অমর ঘোষ, সুরেন ঘোষ, ভূপেন দত্ত, রবি সেন, হেম সেন, সত্য গুপ্ত প্রভৃতির কর্মপ্রতিভা এখানে সুন্দর বিকাশ লাভ করে। বাংলার তরুণেরা সত্যই দেশের কাজে একটা নতুন অবদান যোগাল। বিপ্লবী সংগঠন না হলে ১৯৩০-৩৪ সালের ঘটনাগুলি ঘটিতে পারত কিনা সন্দেহ। এই ধাপ পরবর্তী ধাপের জমি তৈরি করে দিয়েছিল।

এই দিনেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখলের ও জালালাবাদের গৌরবময় যুদ্ধের এবং তার পরিপোষক পরবর্তী ঘটনাগুলির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গান্ধীজি একে সেদিন সার্কাস বলে উপহাস করেন। এরপর কি হল, শুনুন অনন্ত সিং-এর 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সংগঠন : প্রস্তুতি' লেখা থেকে : '১৯২৯ সালে ১১, ১২ ও ১৩ মে-তে আমাদের উদ্যোগে জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের আয়োজন হল। সঙ্গে আরও তিনটি সম্মেলনের ব্যবস্থা হল। ছাত্র, যুবক ও মহিলা সমিতির সম্মেলন। মহাসমারোহে আমাদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এই সব সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন হয়। সুভাষচন্দ্র সেই রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আমাদের সামরিক কায়দায় শিক্ষিত ও সামরিক পোশাকে সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেখে তিনি খুশি হন। তারপর দুপুরবেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে গণেশ ত্রিপুরা সেন ও আমি অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে যতদূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে আমরা মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সুভাষচন্দ্রকে জানালাম কংগ্রেসের নন ভায়োলেন্স নীতি আমরা সমর্থন করি না। আমরা মাত্র কৌশল হিসাবে নন-ভায়োলেন্স নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলি এবং নন-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য, আমাদের মনোভাবের আভাষ পেয়ে আমাদের যুব বিদ্রোহের কল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।'

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোর জেলে দীর্ঘকাল অনশনের পর 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামী যতীন দাসের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম। পরিচয় ছিল মেজর যতীন দাস। তাঁর মৃত্যু চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করে।

ঐ সালেরই আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, লাহোর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হয়। এই সভায় সভাপতি হিসাবে জওহরলাল সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ভাষণে বলেছিলেন '···ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস অথবা জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হিংসার আশ্রয়েই আমরা আমাদের দাসত্ব মোচন করিতে সমর্থ হইব, আমরা নিঃসন্দেহে হিংসার পথ বাছিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইব না। হিংসা মন্দ হইতে পারে কিন্তু পরাধীনতা অধিকতর মন্দ।'

সুভাষ সেদিন বিকল্প সরকার বা প্রতিদ্বন্দ্বী সমান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই বলিষ্ঠ প্রস্তাব গ্রহণ করার মত প্রকৃত

নেতৃত্বের অভাব দেখা গেল কংগ্রেসের মধ্যে।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ডাক দেওয়া হল। আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল।

গান্ধীজি বুঝলেন লগ্ন উপস্থিত। তিনি লবন সত্যাগ্রহ কেন্দ্র করে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের নির্দেশ দিলেন। যে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩০ সালের ১৬ মার্চ।

স্বাধীনতা দিবস আরম্ভ হওয়ার আগেই সুভাষকে তাঁর জন্মদিনে ২৩ জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে চট্টগ্রামের সাম্যাশ্রমে বসে কংগ্রেসের চট্টগ্রাম শাখার সেক্রেটারী সূর্য সেন ভাবলেন, সত্যিই তো লগ্ন উপস্থিত। যা আজই করতে পারা যায় তা এখনই করে ফেলা উচিত। আর দেরী নয়। আপন পাঁজর জ্বালিয়ে তিনি ঈপ্সিত বিকল্প সরকার গঠন করে দেশকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।

তারপর যা ঘটেছে মহাকাল তার সাক্ষী। ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ রাত ১০টার পর চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের পর শত্রু মুক্ত হয়েছিল। ইংরেজের পতাকা নামিয়ে উর্দ্ধে উড়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকা-ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেনের সম্মানে তিন রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। তিন-বার আকাশ বাতাস মুখরিত করে উঠেছিল জয়ধ্বনি : বন্দে মাতরম্।

সামরিক পোশাকে সজ্জিত ৬৪ জনের একটি সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করে অভিবাদন জানিয়েছিল তাদের প্রেসিডেণ্টকে।

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ?

ক্ষণিকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে স্বর্গ সুখ তায়।'

ঠিক এরপরই একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত।

বিধাতা বিরূপ। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আর তাঁদের প্রধান স্রোতের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব হল না।

হল জালালাবাদ পাহাড়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধ। বারো জন বিপ্লবী শহীদ হলেন। হ'ল ফেণী স্টেশনে সংঘর্ষ। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত হাজির হলেন কলকাতায় বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষের

আস্তানায়। খবর পৌঁছাল শরৎ বসুর কাছে। তিনি কালীবাবুকে দিলেন নিজের ড্রাইভার সমেত গাড়ি, দিলেন টাকা। বললেন, যে করে পার জীবন ও আনন্দকে বাঁচাও। তখন এঁদের জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করবার জন্য ইংরেজ সরকার মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

যাইহোক, শেষ অবধি ভূপেন দত্তের চেষ্টায় চন্দননগরে আশ্রয় মিলল। শরৎ-বাবু নিশ্চিন্ত হলেন। সে সময় গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে। শরৎবাবু ইংরেজের কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন। চট্টগ্রামে ধরা পড়েছে বহু তরুণ বিপ্লবী। বৃটিশ সরকার মামলা আরম্ভ করেছে এঁদের বিরুদ্ধে।

আইন অমান্য আন্দোলন উঠল শিকেয়। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবরেণ্য নেতা শরৎ বসু প্রাণের টানে ছুটে এলেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী পক্ষের হয়ে মামলা লড়তে। সে সময় সূর্য সেন চট্টগ্রামে আত্মগোপন করে গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। শরৎবাবু তাঁর কাছে খবর পাঠালেন, আপনি এখন যেখানে যে ভাবে আছেন তাতে আশঙ্কা হয় বৃটিশ সিংহের থাবা থেকে খুব বেশিদিন নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবেন না। আপনার জীবন অমূল্য। অসময়ে দীপ নির্বাপিত হলে দেশের হবে অপূরণীয় ক্ষতি। যদি অনুমতি করেন, গোপনে সাগরপারের এমন এক জায়গায় আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি যেখানে ইংরেজের সাধ্য নেই, আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

উত্তর এল যথাসময়ে। আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ। চট্টগ্রাম আমি এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে পারি না। যে সব মুক্তিপাগল তরুণ আমার নির্দেশে জালালাবাদ পাহাড়ে' কালারপোলে, কালর্ভাটের নিচে, দেশের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে ;

যারা আজ জেলে বন্দি হয়ে অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে অতন্দ্র জীবন যাপন করছে, তারা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তাদের প্রিয় নেতা মাষ্টারদা কি করেন সেটা দেখবার জন্য। আমি চিরবিদ্রোহী। সংগ্রামে যার শুরু একদিন হয়ত ফাঁসীর রজ্জু চুম্বন করে তার শেষ হয়ে যাবে। মন্দ কি? এক সূর্য গিয়ে হাজার সূর্য জেগে উঠবে। ওরা আকাশ বাতাস মথিত করে গাইবে শিকল ভাঙার গান। সে যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

শরৎচন্দ্র অভিভূত।

তিনি একদিন এলেন অনন্ত সিং-এর সঙ্গে আইন সংক্রান্ত আলোচনা করতে। কাছাকাছি ছিলেন জেলার। তাঁকে শরৎবাবু বললেন, আমাদের গোপন শলাপরামর্শ। সেটা কি আপনার শোনা আইন সঙ্গত হবে?

লজ্জিত জেলার, 'সরি' বলে পড়লেন কেটে।

শরৎবাবু অনন্ত সিং-এর দিকে চেয়ে বললেন:

'কারার ঐ লৌহ কপাট

ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'

কি মনে হচ্ছে, পারবে?

–চেষ্টা করতে পারি।

–কত টাকা লাগবে?

—আপাততঃ পাঁচ হাজার।

ঠিক আছে, টাকার জন্য অসুবিধা হবে না। সে ভার আমার। শুভস্য শীঘ্রম, উইস, ইউ বেস্ট অফ লাক।

পরের বার যখন শরৎবাবু এলেন চট্টগ্রামে, সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি সুটকেস। এটি গোপন পথে প্রীতি উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন সূর্য সেনের কাছে। তাতে ছিল নগদ দুহাজার টাকা আর চারটি তাজা টি. এন. টি হাত বোমা।

যতীন্দ্রমোহন ছিলেন গান্ধীজির একান্ত অনুগামী এবং অহিংসা পথের পথিক তবু প্রয়োজনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবীদের পাশে জটায়ু পাখীর মত ডানা মেলে দাঁড়াতে দেখেছি তাঁকে–রেলওয়ে ডাকাতির কেসে (case) সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহের বিরুদ্ধে সরকার মামলা শুরু করেন। আসামী পক্ষে দাঁড়ান তখনকার কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর সূক্ষ্ম আইন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ মামলা পরিচালনার ফলে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিং উক্ত মকর্দমায় বেকসুর খালাস পান।

আর একটি ঘটনা–কুখ্যাত ডি. এস. পি খান বাহাদুর আসাদুল্লাকে মাষ্টারদার নির্দ্দেশে খেলার মাঠে সুযোগ বুঝে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে, কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে—শুরু হলো অমানুষিক অত্যাচার—হরিপদকে নিয়ে ফুটবল খেলতে লাগলো—উপস্থিত

পুলিশ দল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শ্বেতাঙ্গ মেজিষ্ট্রেট এবং শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসারেরা—তাঁরা গুণ্ডা লেলিয়ে চুর্ণবিচুর্ণ করালেন স্থানীয় 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার প্রেস মেশিন। মুসলমানদের প্রকাশ্যে উৎসাহিত করলেন হিন্দুদের বাড়ী ঘর দোকান লুট করতে। গুর্খা সৈন্যদের ছেড়ে দিলেন স্থানীয় হিন্দুদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে ধূলিস্যাৎ করে দিতে। এই খবর চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠান হলো।

সেখানে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটুটে (University Institute) চট্টগ্রামের জনসাধারনের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট জনসভায় অনলবর্ষী ভাষায় সুবক্তা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রতিবাদ জানান। এই সভায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন শাসমল ও দেশপ্রিয়কে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই বেসরকারী তদন্ত কমিশন চট্টগ্রামে এসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিশি বর্বরতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং লাঞ্ছিতা মা বোন ও নির্যাতিত সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেন। সহরেও ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিচালনায় চলে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ। তাছাড়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন স্বস্ত্রীক ইংলণ্ডে যান। সেখানেও হাউস কমনস্ (House of Commons), চট্টগ্রামে পুলিশি বর্বরতার বিবরণ জ্বালাময়ী ভাষায় পার্লামেণ্টারী বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেন। স্বদেশে এবং বিদেশে এই ভাবে ঝড় তোলার ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নেলসন হলেন অপসারিত। জেল মেজিষ্ট্রেট কেন নিলেন অবসর। হাণ্টার হলেন বেহদিস। আর পুলিশ সুপারেটেনডেণ্ট সুটার করলেন আত্মহত্যা। এর ফলে ইংরাজের রোষ বহ্নি পড়ল দেশপ্রিয়ের উপর। ২০ জানুয়ারী ১৯৩২ বোম্বাই বন্দরে জাহাজ ভিড়তেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। অন্তরীন করে রাখা হলো দার্জিলিং-এ বেঙ্গল রেগুলেশন অ্যাক্টের ৩নং ধারায়, বিনাবিচারে। রক্তের চাপ বাড়লো। অনেক লেখালেখির পর আনা হলো—জলপাইগুড়ির জেলে। রোগের কোন উপশম নেই—তখন পাঠান হলো কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য। সুস্থ হয়ে উঠার আগে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হলো রাঁচীতে। এই অবস্থাতেই ২২ জুলাই ১৯৩৩ বিনা বিচারে আটক অবস্থায়—চট্টগ্রাম তথা বাংলা ও ভারতের অবিসংবাদিত নেতা ও শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সন্তান দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিনা মন্তব্যে

[অনন্তসিংহ এবং গণেশ ঘোষের ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০. মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পরবর্ত্তীকালে চন্দননগরে থাকা কালীন অনন্ত সিংহ পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শৈলেশ দে এবং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের সহযোদ্ধা, কালিপদ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী চৌধুরী, বিনোদবিহারী দত্ত এবং অর্দ্ধেন্দু গুহের মতামত "বিনা মন্তব্যে" এখানে রাখা হলো। —সম্পাদক]

ইতিহাস বড় নির্মম ও ক্ষমাহীন। সত্যকে ব্যক্ত করাই তার ধর্ম। কঠিন, কঠোর ও বেদনাদায়ক হলেও ইতিহাসে সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কথা ছিল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত ঠিক দশটায় মহান নেতা মাষ্টারদার নেতৃত্বে শুধু পুলিশ আর্মারী বা অক্সিজিলিয়ারী ফোর্স আর্মারী নয়, সেই সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা ইত্যাদিও দখল করা হবে একই দিনে, একই সঙ্গে।

হঠাৎ সবকিছু বানচাল হয়ে গেল অভাবনীয় একটি ঘটনার ফলে। পুলিশ আর্মারী দখলের পরেই এক সময়ে দেখা গেল, মাস্টারদার সবচাইতে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ দুই সেনানায়ক অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ঘটনাস্থলে নেই। জানা গেল, তাঁরা নাকি আহত হিমাংশু সেনকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য কখন গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ঘটনাস্থল থেকে। সঙ্গে গেছেন তাঁদের দুই স্নেহাস্পদ কমরেড আনন্দ গুপ্ত ও মাখন (জীবন) ঘোষাল।

এদিকে সবাই তখন চিন্তিত। হিমাংশুকে পৌঁছে দিয়ে বহু আগেই তো তাঁদের ফিরে আসার কথা। তাহলে এত দেরি হচ্ছে কেন? তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে।

ফল হল সুদূরপ্রসারী। বিশ্বস্ত দুই সেনানায়কের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে বাধ্য হয়েই বাকি কাজগুলি অসম্পূর্ণ রেখে মাষ্টারদাকে আশ্রয় নিতে হল

পাহাড়ে-জঙ্গলে। ফলে, এ জীবনে আর কোনদিনই তাঁর দেখা হলনা অনন্ত সিংহ বা গণেশ ঘোষের সঙ্গে।

অবশ্য পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় অনন্ত সিংহ বলেছেন—তাঁরা (হিমাংশু ও আনন্দ গুপ্ত বাদে) নাকি আবার ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু কাউকেই দেখতে পাননি পুলিশ আর্মারীতে। তাঁর নিজের ভাষায় :

"হিমাংশু ছুটে এসে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে পড়লো ও তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও মাখনও এসে উঠলো ; গণেশ আমার পাশে।···টিলার নিচে হিমাংশুকে নামিয়ে দিলাম।···হিমাংশু নীরবে নেমে গেল।

···আমরা খুব ক্লান্ত। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গাড়িটি সোজা বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভেতরে নিয়ে গেলাম! ···আমরা আমাদের পোশাক পরিবর্তন করলাম। ভারী বুটপট্টি, লেগিং ও খাকী পোশাক আমাদের বড়ই ক্লান্ত করে তুলেছিল।···তখন রাত প্রায় তিনটে। গাড়ি করে খুব তড়িদ্বেগে আবার পুলিশ লাইনের দিকে ছুটলাম। ···সেখানে কোথাও আমাদের প্রধান-দলের অস্তিত্ব দেখতে পেলাম না।

[চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ : ১ম খণ্ড : পৃ : ১৪১-১৪৪]

আমি বিপ্লবী নই। বিপ্লববাদ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তাই—সর্বাধিনায়ককে না জানিয়ে, তাঁর বিনা অনুমতিতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা—সেই চরমমুহূর্তে সবাইকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে পিপাসা ও ক্লান্তি বিনোদনের জন্য নিজের বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে বিশ্রাম করা—পরে পুলিশের কাছে অনন্ত সিংহের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের ঘটনা বিপ্লববাদে বিশ্বাসী পাঠক-পাঠিকাগণই তার যথার্থ মূল্যায়ন করবেন আশাকরি। আমি শুধু সত্যের খাতিরে ঘটনাটি তুলে ধরলাম মাত্র।

অথচ কি বিপরীত ছবিই না দেখা গেল চারদিন বাদে জালালাবাদ পাহাড়ে। মেসিনগান নিয়ে উন্মত্তের মত ধেয়ে আসছে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার ও সুর্মাভ্যালি রাইফেলস্ বাহিনী। পাহাড় শীর্ষে অনুগত সহকর্মীদের নিয়ে মাস্টারদা। অনাহার ও অনিদ্রায় সবাই তখন কাতর। এমন কি পিপাসা মেটাতে গিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল পর্যন্ত গলায় ঢেলেছেন কেউ কেউ। তবু নিজেদের সঙ্কল্পে তাঁরা অটল, অনড়। আসুক না মিলিটারী, তবু প্রাণ থাকতে কোনমতেই আত্মসমর্পণ নয়।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মাস্টারদা কিছুটা চিন্তিত। সংগ্রাম আসন্ন, অথচ মূলবাহিনী থেকে প্রধান দুই সেনানায়ক প্রথম দিন থেকেই বিচ্ছিন্ন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তিনি তুলে দিলেন ছাত্র নেতা লোকনাথ বলের হাতে। ভয়ঙ্কর সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ছোট ভাই ট্যাগরাকে হারিয়েও লোকনাথ বল সেদিন যে সাহস, শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের নিদর্শন রেখেছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজীর আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই।

এ প্রসঙ্গে আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তিনি হলেন মাষ্টারদার সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী-যুববিদ্রোহের অন্যতম নেতা নির্মল সেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত যেভাবে তিনি নিজের বিরাট বুক দিয়ে মাষ্টারদাকে আড়াল করে রেখেছিলেন, তারও কোন তুলনা নেই। শেষ পর্যন্ত মাষ্টারদাকে বাঁচাতে গিয়েই তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন ধলঘাট সংগ্রামে।

পরিতাপের কথা, বিপ্লববাদের ইতিহাসে লোকনাথ বল ও নির্মল সেন;—এ দুটি মানুষের সঠিক মূল্যায়ন আজো করা হয়নি। তেমনভাবে কেউ চেষ্টা করেছেন বলেও শুনিনি। তাই তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা কিছুটা আড়ালেই রয়ে গেছে চিরদিন।

খবর শুনে গোটা বিপ্লবী সমাজ বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। অনন্ত সিংহ তখন কিংবদন্তীর নায়ক বলে সর্বত্র পরিচিত। তাঁর মত দুর্ধর্ষ বিপ্লবী যে কোনদিন পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে পারে একথা সবার কল্পনারও বুঝি বাইরে ছিল।

কেন এমন হল। কোথায় এই রহস্যের উৎস।

না, এ জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে কোনরকম আলোকপাত করতে তিনি রাজী নন। তাঁর বক্তব্য—'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে যুব বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই।' কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক নয়, তবু মনে একটা প্রশ্ন জাগে। বিপ্লবী জীবনে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কতটুকু! সুপ্রীম কমাণ্ডারের নির্দেশ পালন করাই কি বিপ্লবী জীবনের শেষ কথা নয়?

এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' থেকে কিছুটা অংশ আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি মল্লিকা:

'আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই – পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যে পরিহাস। ওসব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল – এই আমার মন্দ, এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই।'

ছেড়ে দিই অন্যের কথা। শ্রীযুক্ত সিংহের সহকর্মীরাই কি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাঁর সেই আত্মসমর্পণের ঘটনাকে! না, পারেন নি। তাঁরই একান্ত স্নেহের পাত্র যুব বিদ্রোহের অন্যতম অংশীদার শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দু গুহ এ সম্বন্ধে কি বক্তব্য রেখেছেন দেখা যাক।

...অনন্তদার আত্মসমর্পণ মাষ্টারদাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে এবং অনন্তদার এই কাজ যে সুস্থ বিপ্লবীমনের পরিচয় নয় একথাও মাষ্টারদা খুব ভালভাবেই জানেন।...বিপ্লবী লক্ষ্য অর্জনের আগেই অনন্তদা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আত্মসমর্পণের কারণ যাই হোক না কেন, এই কাজ তাঁর বিপ্লবীচরিত্রের এবং নেতৃত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল...!' [বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মৃতি : পৃ : ১৪৮-১৫০] দুর্ভাগ্য চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীবৃন্দের। দুর্ভাগ্য মহান নেতা মাষ্টারদার। সেদিন তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা সার্থক হলে চট্টগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস যে আরো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত অনেক ইচ্ছাই তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল আকস্মিক এই বিভ্রান্তির ফলে।

'অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি' – কালীপদ চক্রবর্তী পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫০-৫১ থেকে :

'অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা কাতর মৃতপ্রায় হিমাংশুকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত। নেতৃবৃন্দের সামনে এখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন – হিমাংশুর জন্য কিছু একটা করা।...অনন্তদা ও গণেশদা তাকে নিয়ে একটা গাড়িতে চড়ে বসল। গাড়িটা চলা শুরু করতেই জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তও উঠে পড়ল গাড়িতে।...বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত থাকা সত্ত্বেও অনন্তদা ও গণেশদার পক্ষে সাময়িকভাবে হলেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি।

কম দায়িত্বশীল লোক দিয়েই তো হিমাংশুকে তার বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যেত : তাই হত যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন।

কালীপদ চক্রবর্তীর বই-এর পৃষ্ঠা ৯৯-১০০ থেকে :

'হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়লাম অনন্তদা মোটরে ডি. আই. বি হেড কোয়ার্টার ইলিসিয়াম রোডে নিয়ে পুলিশ আই. জি. লোম্যানের কাছে ধরা দিয়েছেন।······

দলের অন্যতম কেন্দ্রমণি, যার শৌর্যে, বীরত্বে আমরাও গর্বিত। বুদ্ধি বিবেচনা ও চেতনার দিক দিয়ে সাধারণের চাইতেও যিনি অগ্রনী তাঁর পক্ষে এ কাজ নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ব্যাপারের উর্ধ্বে। যখন সমষ্টিগত স্বার্থই প্রধান তখন এ ধরণের কাজটা সঙ্গত মনে হয়নি। ভাবাবেগে পরিচালিত হওয়া অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে যদিও তা হয়নি, বরঞ্চ রাজসাক্ষীদের মন পরিবর্তনের দিকে জয়লাভ করেছেন, তবুও দেশের জনসাধারণ এটাকে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মেনে নেবে না।···'

বিনোদ বিহারী চৌধুরী, সূর্য সেনের সহযোদ্ধা। জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

তিনি 'জালালাবাদ যুদ্ধ, সেনানায়ক লোকনাথ বল', প্রবন্ধে লিখেছেন :

'···আমরা সব বিপ্লবীদল সফল কর্মকাণ্ডের পর যখন পুলিশ হেড কোয়ার্টার সমবেত হয়ে মিলিটারী কায়দায় ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির প্রেসিডেণ্ট প্রিয় নেতা মাষ্টারদাকে গার্ড অফ অনার দিলাম এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা যখন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তার পরেই একটি দুর্ঘটনা ঘটল।···আর্মারিতে পেট্রোলে আগুন লাগাতে গিয়ে (আগু) হিমাংশু সেন অগ্নিদগ্ধ হয়। হিমাংশু গুরুতর আহত। উচিত ছিল তার কষ্ট লাঘবের জন্য অচিরে শেষ বিদায় দেওয়া। তা না করে আমাদের জি. ও. সি ও জেনারেল তাকে নিয়ে মটরে করে চলে গেলেন অন্যত্র সরিয়ে রাখার জন্য। ইহা ছিল বিপ্লবীদলের হিমালয়ান ব্লানডার।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকেন আর্মির তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট বিনোদ দত্ত বলেন—"পেট্রলে নিমেষে আগুন ধরে গেল হিমাংশুর সারা দেহে। মাষ্টারদা, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীরা মূল দলকে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হিমাংশুর 'অনন্তদা বাঁচান' 'অনন্তদা বাঁচান' ধ্বনি অনন্তদার লৌহসম দৃঢ় ও কঠিন হৃদয়কেও গলিয়ে দিল। অনন্তদা তাড়াতাড়ি হিমাংশুকে গড়িয়ে দিলেন মাটিতে এবং চকিতে হিমাংশুকে গাড়িতে তুলে নিলেন। গণেশদার ভীষণ জ্বর গায়ে Pox-এর গুটি দেখা দেয়—তিনিও

সেই গাড়িতে উঠে পড়লেন। সঙ্গে মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত—এটা এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল যে মাষ্টারদার সাথে আলাপ আলোচনার কোন সুযোগ মেলেনি—এই বিচ্ছিন্ন হওয়া দুর্ঘটনা ইচ্ছাকৃত ভাবে হয়নি। তবে এটা অনস্বীকার্য যে এ দুর্ঘটনা আমাদের ছন্দের পতন ঘটালো এবং আমরা আকস্মিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম।

১. শৈলেশ দে ২. কালিপদ চক্রবর্তী
৩. বিনোদবিহারী চৌধুরী ৪. বিনোদবিহারী দত্ত
৫. অর্ধেন্দু গুহ

পরিশিষ্ট ১

EARLY LIFE OF (LOKADA)

Loknath Baul was the second son of retired shestadar of Noakhali collectorate, both graduated (B.A.) in 1929 from Chittagang college and in July of that year, he went to Calcutta to study Law, then returned to chittagang by the end of 1929.

During the period 1924-26, circular under the previsions Bengal ordinance no I of 1924 or of sect II Bengal criminal Law Amendment Act of 1925, and subsequetly returned on 18.9.28. After release Loknath Baul lived in Patherghata along with his brothers Bholanath emplyed in A.B. Rly. office and Horigopal, stndent of municipal school and attended the Ctg. college from where he passed BA. 1929.

(রাইটার্স বিল্ডিং-এর আরকিটেক্ট থেকে সংগৃহীত।)

পরিশিষ্ট ২

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

চট্টগ্রাম, ১লা অক্টোবর : নূতন স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে গত সোমবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। সোমবার আরম্ভ করিয়া মঙ্গলবারের জলযোগের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী উকিল রায় বাহাদুর রমণী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা হইতে আগত) তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করতঃ মামলার বিবরণ কমিশনারগণের সমক্ষে উপস্থিত করেন।

এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ না হইতেই কমিশনারগণ রায় প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবার সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইবার পর প্রথম সরকারী সাক্ষী এস. ডি. ও. মিঃ রায় সাক্ষ্য দেন ও বলেন, তিনি নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেন আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে কি রকম চার্জ হইতে পারে সরকারী উকিল তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেসিডেন্ট সকল আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। অতঃপর ৭ জন আসামী শ্রীঅর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, সুশীল সেন, প্রভাত দত্ত ও অনিল রক্ষিত উক্ত ধারায় আপনাদিগকে দোষী বলিয়া এবং অপর ৪ জন হৃদয় দাস, চন্দ্রকুমার বসু, নিশি দে ও আশুতোষ দে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করে।

অতঃপর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ সেন (অবশ্য অন্য দুইজন কমিশনারের সম্মতিক্রমে) নিশি দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসুকে বেকসুর খালাস দেন ও অপর ৮ জনের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেনকে ৩ বৎসর, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মল্লিককে দুই বৎসর এবং অনিল রক্ষিত ও প্রভাত দত্তকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে কারাগারে 'বি' শ্রেণীভুক্ত রাজবন্দীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এক্ষণে শুধু একজন আসামী হৃদয় দাসের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মামলা চলিতেছে।

বঙ্গবাণী : ৬-১০-৩১

পরিশিষ্ট ৩

ডঃ আশা দাসকে বিপ্লবী গণেশ ঘোষের চিঠি

১৫নং যদু ভট্টাচার্য লেন,
কালিঘাট, কলিকাতা
৫ই ফেব্রুয়ারী ৮০

ডাঃ আশা দাশ,
৪জি, রাধানাথ চৌধুরী রোড,
কলিকাতা-১৫

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সেদিন দুপুর বেলা আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমি সেই সময়ে ঘুমিয়েছিলাম; আপনার সাথে দেখা হয়নি; আপনি চলে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ঘুম থেকে উঠে আমি যখন আপনার কথা শুনলাম ও আপনার বইখানি পেলাম তখন আমি খুবই দুঃখিত হলাম এবং সেই থেকে আমি নিজেকে খুবই অপরাধী মনে করছি। আমার সেই ত্রুটির জন্য আমি আপনার কাছে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা কোরছি।

আপনার বাড়ীর ঠিকানা আমার জানা নেই; তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি, আপনার পুস্তকের প্রকাশকের (মনে হচ্ছে উনি হয়ত আপনার ভগ্নি) ঠিকানায় একখানি পত্র লিখছি। এই পত্র দুইখানির যদি একখানিও আপনার হস্তগত হয়, দয়া কোরে প্রাপ্তিস্বীকার জানিয়ে এবং কোন ঠিকানায় কখন গেলে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হোতে পারবে ও আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা সম্ভব হবে জানিয়ে বাধিত কোরবেন। আমি আপনার কাছে গিয়েই আমার ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা ক'রে আসব।

আপনার বইখানি দেখে খুবই ভাল লাগল। এখনও সবটা প'ড়ে উঠতে পারিনি; তবে কয়েকবার খুব নিবিষ্টভাবে উল্টেপাল্টে দেখেছি। ১৯৩০ সালের

চট্টগ্রামের বিদ্রোহ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত লেখা প্রকাশিত হোয়েছে মনে হয় আপনি সব কিছুই কষ্ট ক'রে সংগ্রহ ক'রে প'ড়েছেন। আপনার বইখানি আমার খুবই ভাল লেগেছে এবং মনে হোচ্ছে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ও গবেষণামূলক সৃষ্টি; আগামী ২।৪ দিনের মধ্যেই আশা করি আমার পক্ষে বইখানি পড়া শেষ হ'য়ে যাবে; তারপর আপনার কাছে গিয়ে আমার মতামত জানাব।

আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। ইতি।

আপনার গণেশ ঘোষ

পরিশিষ্ট ৪

প্রবোধরঞ্জন সেনের দুটি চিঠি

(দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত)

ছয় জুলাই ১৯৯১ তারিখের 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' কলমে 'মুক্তিপথের একলা পথিক' প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী. বর্তমান পিজি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে রোগ-শয্যায় শায়িত গণেশ ঘোষের স্মৃতিতে ভেসে ওঠা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানের যে অধ্যায়ের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে ভুলভ্রান্তি অনেক। জানি না, গণেশদা'র স্মৃতি-বিভ্রমজনিত কিনা। আর তাও যদি হয়, আপনাদের বহুল প্রচারিত ও পঠিত এই সকল কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে ঐতিহাসিক রেকর্ড ইত্যাদি দেখেশুনে দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি। কেননা, কিছুদিন বাদেই হয়তো এই সকল ভুল বিবৃতি-বিবরণী উদ্ধৃত করে আগামী দিনের বিপ্লবেতিহাস রচিত হবে,—যেমন এখন থেকেই প্রকাশিত নানা বিকৃত তথ্যসংবলিত লেখা, পুস্তক ইত্যাদিতে দেখতে পাই।

প্রথমত, "১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল রাত সোয়া দশটা নাগাদ বাংলার বিপ্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।"

এটা ঠিক নয়। ১৮ এপ্রিলের ঘটনা—দুটি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস, রেল লাইন অপসারণ ও ইয়োরোপীয় ক্লাব আক্রমণ (শেষেরটা সফল হয়নি) ও কার্যত চট্টগ্রাম শহর ও পুর্ব চট্টগ্রাম অঞ্চল বিপ্লবীদের দ্বারা দখল। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ হয়েছিল ২২ এপ্রিল, ৩০। আর এই যুদ্ধে গণেশ ঘোষ ছিলেন না। ১৮ই এপ্রিল রাতেই তিনি অনন্ত সিংহ ও অন্য ২ জন সহ অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেনকে নিয়ে পুলিশ লাইন থেকে মোটর-যোগে সরে যান ও কলকাতায় চলে আসেন। পরে চন্দননগরে আশ্রয় নেন। সে অন্য কাহিনী।

দ্বিতীয়ত, "ওই অভিযানের যাবতীয় পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল ছিল গণেশ ঘোষের বাড়ি।" এটাও ভুল। বরং চট্টগ্রাম অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে গণেশবাবুর ঘরে

বালিশের তলা থেকে বিপ্লবীদের যে বিরাট লিস্ট পাওয়া যায়, তার ফলে অসংখ্য যুবক কর্মী ধরা পড়েন ও এর জন্য নানা পরিকল্পনা ফাঁস ও ব্যর্থ হয়। সেদিন এই অসাবধানতার জন্য আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ গণেশবাবুকেই দায়ী করেন।

তৃতীয়ত, "শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন গণেশবাবু ও অন্যরা"—চন্দননগরের কাহিনী। কিন্তু সত্য ঘটনা এবং পুলিশ রেকর্ড বলে যে, একমাত্র লোকনাথ বলের রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। গণেশবাবু হাত তুলে ধরা দেন। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র অব্যবহৃতই থাকে।

১৭ই অগাস্ট ১৯৯১ প্রবোধরঞ্জন সেন

॥ ২ ॥

গত ১৭/৮/৯১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পত্রখানিতে আমি ৬ জুলাই '৯১ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদকের লেখায় শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী গণেশচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে কিছু তারিখ, তথ্য ইত্যাদির ভুলের কথা উল্লেখ করেছিলাম এই জন্য যে, 'দেশ'-এর মত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত—বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা সাহিত্যের দিশারী এক মুখপত্রে এ জাতীয় লেখা ভুলভ্রান্তি রহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়—এটা মনে করে। দুঃখের বিষয়, ৭ ডিসেম্বর '৯১ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয়···বন্ধু বিপ্লবীরা আমার লেখার মধ্যে 'বিকৃত রুচি' ও 'শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীর চরিত্রহনন' জাতীয় দিশাহারা কিছু মন্তব্য করেও ক্ষান্ত হননি, পরন্তু 'তখন তাঁর বয়স কত ছিল?' ইত্যাদি হাস্যকর প্রশ্নেরও অবতারণা করেছেন।

পুনরায় বলি, গুরু প্রশস্তি গুরু বন্দনা ইত্যাদি গুরুবাদী মনোভাব এক, কিন্তু তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত অলীক, অতি ও অতিশয়োক্তি অন্য জিনিস। আমার মতে এ সবের ফলেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির চরিত্রের অব মূল্যায়ন শুধু নয়, অবমাননাও করা হয়। গণেশদাকে 'মহাবলী' না করলেও গণেশদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা বা প্রাধান্য বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। তাঁরা আমার বয়সের প্রশ্ন তুলেই বা কি উত্তর চান? তাঁদের অনেকের কাছাকাছি আমার বয়স। আর আজকের দিনে শহীদ ক্ষুদিরাম, বা বঙ্গভঙ্গ বা কলকাতার প্রাচীন তথ্য লিখতে গেলে কি

লেখকের সেই 'সমকালীন' হওয়া প্রয়োজন? আর পুলিশের রেকর্ড নথিপত্র দেখার প্রয়োজন, প্রতিটি অগ্নিযুগের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে, কেননা সে দিনে ছিল সব গোপন সংগঠন। এ-কথা তো তাঁদের অজানা নয়।

তদুপরি এ বিষয়ে অর্থাৎ গণেশদার চট্টগ্রামের বাসা থেকে চট্টগ্রাম অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা আবিষ্কার তৎকালীন সরকারী নথিপত্র, স্পেশাল ট্রাইবুনালে উপস্থাপিত নানা তথ্য ও একাধিক পুস্তকে প্রকাশিত। ডঃ আশা দাশ রচিত পুস্তক 'ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান'-এর ৫১ পৃ.-ও দ্রষ্টব্য। চন্দননগরের সঠিক কাহিনী ও প্রয়াত শশধর আচার্যের লেখা, (উল্লেখ্য, যুগান্তর দলের নির্দেশে শশধর আচার্য ও প্রয়াতা সুহাসিনী গাঙ্গুলি স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে চন্দননগরে যে বাসা ভাড়া করেন, সে বাসাতেই গণেশদাদের সেণ্টার ছিল)— যেটা নিকটেই আছে। তাতে সেদিনকার ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। সুতরাং আমার দেওয়া বর্ণনায় বিন্দুমাত্র অসত্য বা কুৎসার কথা অবান্তর মনে করি।

১৮ই জানুয়ারি ১৯২২ — প্রবোধরঞ্জন সেন